
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
গল্প বলি
গল্প শোনো

গল্প বলি গল্প শোনো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অশোক প্রকাশন
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭৬

॥ দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা বারো হইতে অশোক প্রকাশন-এর পক্ষে
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬৬ গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা ৬ হইতে
নবজীবন প্রেস-এর পক্ষে শ্রীকালীচরণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

গল্প বলি গল্প শোনো

এতে আছে—

স্নেহের পল্টুকে দিলাম

জ্যেঠাবাবু

এই লেখকের লেখা ছোটদের বই

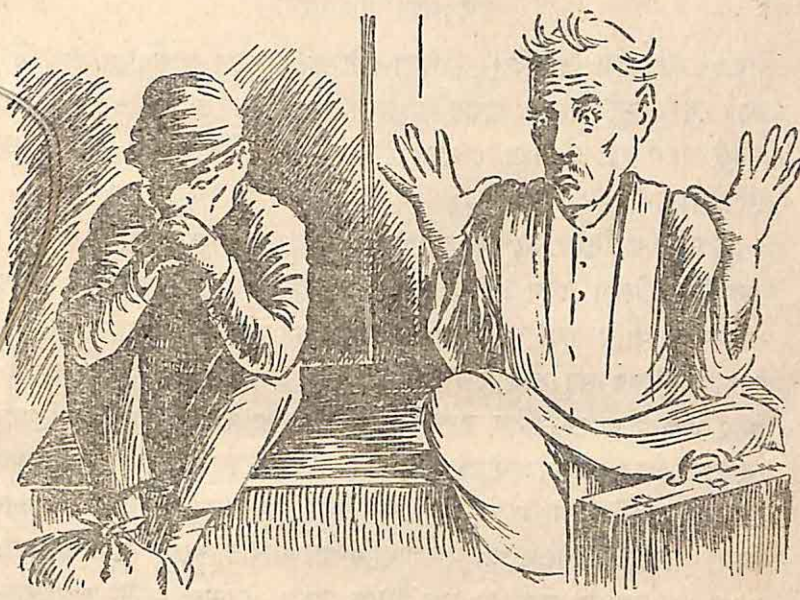
ঘনাদার গল্প, অদ্বিতীয় ঘনাদা, ঘনাদা চতুর্মুখ,
চাঁদ তারা, জোনাকীরা ইত্যাদি।

ছোটদের জন্যে অশোক প্রকাশন যে নতুন বইএর সারি সাজাচ্ছেন তার পাইকারী নাম হল, 'গল্প বলি গল্প শোনো'।

কিন্তু 'গল্প বলি' বলে হাঁক দিলেই কি ছোটোদের গল্প শুনতে বসানো যায়? আর বসাতে পারলেও তাদের মনগুলো ধরে রাখা কি সোজা?

মোটেই নয়। ভড়ং দেখিয়ে, কি ফাঁকি দিয়ে বড়দের কাছে অনেক সময় হয়ত পার পাওয়া যায়, কিন্তু ছোটোদের কাছে সেটি হবার যো নেই। তাদের মনের কষ্টি-পাথরে ভালো মন্দের যাচাই হয় একেবারে অন্য নিয়মে।

এই সারির বইগুলির সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'গল্প বলি গল্প শোনো' বলে জোর গলায় ডাক দেওয়ার বদলে 'গল্প একটা শুনবে?' বলে মিনতি করতে পারলে তাই বেশী খুশী হতাম।



হাতীর দাঁতের কাজ

এ কাহিনীর যেমন খুশী মানে অবশ্য করা যেতে পারে। সাধারণ প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনার সীমা যেখানে শেষ হয়ে আজগুবির কিনারায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে এ কাহিনীর জন্ম। নিজেদের মনের পাল্লা যে দিকে যেমন ঝুঁকবে সেই হিসেবেই এ গল্পের রূপ বদলে যেতে পারে। শুধু ঘটনাগুলো আমি নিরপেক্ষভাবে এখানে তাই বলে যাব।

ব্যাপারটার আরম্ভ যে ভাবে হয়েছিল, তা স্মরণ করলে এখনও আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি। সেই অন্ধকার বাদলার রাত, থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আকাশের অসহ্য গুমোট আর কাটতে চাইছে না। মোগলসরাই স্টেশনের থার্ডক্লাশের ওয়েটিং রুম ঠিক নয়, টিনের চাল দেওয়া বিশাল শেডের তলায় একেবারে একলা রাত দুটোর একটি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি, আর আকাশের মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিধারে ইঞ্জিনের সান্টিং, মালগাড়ির পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা ও বিশাল জংশন স্টেশনের অসংখ্য অস্বাভাবিক

অদ্ভুত আওয়াজ শুনছি। বিশাল টিনের শেডের মাঝখানে মিট্‌মিট্‌ করে যে একটি মাত্র তেলের আলো জ্বলছে, তাতে সামনের অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র, শেডের কোণে কোণে সে আলো একেবারেই পৌঁছোয় নি।

শেডটি যাত্রীদের অপেক্ষা করবার নয়, আসলে মাল রাখবারই জায়গা। একধারে টিনের চাল পর্যন্ত বড় বড় কিসের বস্তা স্তূপাকার করে সাজান। আমি যেখানটায় ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর বসেছিলাম, সেখানে পরের পর সাজান পিপের পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একপাশে কেরাসিন কাঠের একগাদা বাক্স ভালো করে ঠাহর করে দেখলে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাইরের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত শেড আলোকিত না হয়ে উঠলে অবশ্য এ সমস্ত আমি লক্ষ্য করতাম কিনা সন্দেহ। বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার সমস্ত শেড আরো অন্ধকার হয়ে উঠছে যেন! কেমন একটা অস্বস্তিকর অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, ঘোরালো অন্ধকারে জায়গাটা লাগছে রহস্যময়।

সখ করে অবশ্য এ জায়গায় আসিনি। স্টেশনের কোন ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেয়েই বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুমের সব কটা আসনই ভর্তি, লোয়ার ক্লাশের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে কে একজন যাত্রী হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভয়ানক গোলোযোগ বিশৃঙ্খলা। মাত্র ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলেই গাড়ি পাওয়া যাবে জেনে, শেষে এইখানেই আশ্রয় নিয়েছি।

কিন্তু শেডের তলায় আর কোন যাত্রী না দেখে, প্রথমটা একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি আজকাল আর ট্রেনে চাপে না! তবে রাত এখন অনেক, যাত্রী যা দু একজন আছে, বৃষ্টি সত্ত্বেও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই হয়ত কোনরকমে আশ্রয় নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

নির্জন শেডের ছমছমে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে, মনে হচ্ছিল, আমারও প্ল্যাটফর্মে কোন রকম একটা আশ্রয় খোঁজাই ভাল ছিল।

হাতঘড়িটার উজ্জ্বল ডায়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম সবে একটা বেজেছে। আরো একঘণ্টা এই শেডের তলায় কাটাতে হবে জেনে মনটা বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠল না।

ভয়কাতুরে আমি মোটেই নয়, এতবড় জংশন স্টেশনের যাত্রীনিবাসে বসে ভয় পাবার কোন কথাও নয়, তবু আবছা অন্ধকারে চারিধারে স্তূপাকার মালের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে অস্বাভাবিক নির্জনতার জন্যই বোধহয় কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

বাইরের সান্টিং প্রভৃতির শব্দ ও মেঘের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের এক কোণ থেকে কেঠো পোকার কাঠ কুরে ফুটো করবার একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার একটা শব্দে চমকে উঠে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর বস্তাগুলোর ওপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে অন্ধকারের কোণে চলে গেল। কিন্তু অস্বস্তির কারণ হিসাবে সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পোনেরো মিনিট আরো এই ভাবে কেটে যাবার পর কিন্তু সত্যিই অস্বস্তিটা যেন অত্যন্ত বেড়ে গেছে মনে হল। বড় রেল স্টেশনের শব্দের কোন বাঁধা নিয়ম নেই, হঠাৎ মাঝে মাঝে সব একেবারে থেমে যায়, তারপর আবার সুরু হয় অতর্কিতে। এখন যেন শব্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেইরকম একটা ফাঁক পড়েছে, আকাশে মেঘের ডাক নেই, কেঠো পোকাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েছে, অসাধারণ একটা নিস্তব্ধতা।

সে নিস্তব্ধতা আমার পেছন দিকে খুব কাছাকাছি আচমকা একটা প্রচণ্ড ফোঁসফোঁসানির শব্দে ভেঙে গেল। এটা যে নিকটের কোন লাইনে ইঞ্জিনের ষ্টীম ছাড়ার আওয়াজ তা বুঝেও চমকে ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না এবং সেই মুহূর্তে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

বিচার করে দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার এমন কোন হেতুই অবশ্য ছিল না। কিন্তু যে ঘরে এতক্ষণ নিজেকে একা বলে জেনে এসেছি, সেখানে আচম্বিতে ঠিক নিজের পেছনেই অপরিচিত সাদা

একটি মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলে প্রথমটা একটু বিচলিত হয়ে ওঠাই অস্বাভাবিক বোধহয় নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, লোকটা আমার ঠিক পেছনে ওজন করবার যন্ত্রের ওপরে এসে বসলেও, কখন সে যে ঢুকেছে টেরও পাই নি। এখনও লোকটা ঠিক পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল, এতটুকু সাড়া শব্দও নেই।

আবছা আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে নজর করে দেখলাম। দুটো হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা নীচু করে সে বসে আছে, পাশে একটা ছোট বোঁচকা। পোষাক ও মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই সাধারণ দরিদ্র একজন চীনেম্যান বলে সহজে বোঝা যায়।

বুঝে একটু হতাশই হলাম। এ রকম নির্জন জায়গায় একজন সঙ্গী পেলে খুশী হবারই কথা। দুটো আলাপ করে বাঁচা যায়, কিন্তু চীনেম্যানের সঙ্গে কি আলাপ করব? বাধ্য হয়ে তাই আবার মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চীনেম্যানও আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার বলেই মনে হ'ল। শেডের তলায় আর কেউ আছে বলে তার যেন খেয়ালই নেই।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর আর একবার কৌতূহলভরে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছি, এমন সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মাত্র এক সেকেণ্ডের সেই উজ্জ্বল আলোই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চীনেম্যান মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তার তেরছা আধবোজা চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু আমি তখন যা দেখবার দেখতে পেয়েছি। লোকটার গালের বাঁ ধারে একটা লম্বা কাটার দাগ, বাঁ ভুরুর কোণ থেকে কানের ধার পর্যন্ত টাটকা ও জমাট রক্তে মিশে দগদগে হয়ে আছে।

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চমকে ওঠায় আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল, কিন্তু চীনেম্যানের তাতে ভ্রূক্ষেপও দেখা গেল না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে আগেকার মত নিঃশব্দে নিস্পন্দ ভাবেই সে বসে রইল। মুখের অত বড় কাটাও যেন তা কাছে কিছুই নয়।

এবার রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। এ রকম অদ্ভুত সঙ্গীর সঙ্গে এই নির্জন জায়গায় বসে থাকবার মত মনের জোর তখন সত্যিই হারিয়েছি।

বাইরে বৃষ্টি আবার জোরে পড়তে সুরু করছে, তা সত্ত্বেও উঠে প্ল্যাটফর্মেই চলে যাই ঠিক করলাম। সঙ্গের ছোট সুটকেশটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় বাইরে অনেক লোকের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালটা এই দিকেই আসছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা টর্চের আলো শেডের ভেতর এসে পড়ল, তার পরেই কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ ও একজন কর্মচারীর আবির্ভাব।

টর্চের উজ্জ্বল আলো আমার দিকে ফেলে হিন্দুস্থানী দারোগা সাহেব একটু যেন বিস্মিত ভাবেই এগিয়ে এলেন।

"আপনি—আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে ?"

অবাক হয়ে বললাম, "তা প্রায় দেড় ঘণ্টা !"

"দেড় ঘণ্টা ! আপনি কি একলাই আছেন ?"

"একলা ? না……"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই দারোগা সাহেব উৎসুক ভাবে বললেন, "আর কে ছিল এখানে ? চীনেম্যান, একজন চীনেম্যানকে দেখেছেন ?"

পেছনে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম,—"ওই ত !"

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোথায় সে চীনেম্যান !

দারোগা বাবু আমার মুখের ভাব লক্ষ করে কৌতূহল ভরে বললেন, —"আপনার পেছনেই ছিল নাকি ?"

"এইতো কয়েক সেকেণ্ড আগেই দেখেছি। মুখের বাঁ দিকে একটা কাটার দাগ !"—আমার শুকনো গলা দিয়ে কথাগুলো যেন বেরুতে চাইছে না।

পুলিশেরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল, দারোগা বাবু বললেন— "হ্যাঁ, ঠিক দেখেছেন। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড আগে কি বলছেন ! সে বেরিয়ে যায়নি এখান থেকে !"

"আমার জ্ঞানত ত নয়!"

শেডের মধ্যে স্তূপাকার মালের পেছনে কোন জায়গায় চীনেম্যান লুকিয়ে থাকতে পারে মনে করে পুলিশ তন্নতন্ন করে খোঁজার আর কিছু বাকি রাখলে না। কিন্তু কোন চিহ্নই তার পাওয়া গেল না। কেমন করে সে এক সেকেণ্ডের মধ্যে এমন অন্তর্ধান হয়েছে কে জানে!

হায়রান হয়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত খোঁজা বন্ধ করে শেড ছেড়ে চলে গেল। আগাগোড়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

পুলিশের লোক চলে যাবার পর হঠাৎ খেয়াল হ'ল এ শেডের ভেতর একলা থাকা মোটেই আর নিরাপদ নয়। লোকটার কোন পরিচয় অবশ্য দারোগার কাছে পাইনি, কিন্তু মুখে অতবড় ক্ষত নিয়ে নেহাৎ কোন সাধু পুরুষ যে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না এটুকু বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া তার এই শেড থেকে অন্তর্ধান হওয়ার ব্যাপারটার কোন ব্যাখ্যাই যে পাওয়া যায় না।

কথাটা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল একবার। না আর এখানে একমুহূর্ত নয়। স্যুটকেশটা নীচে নামিয়ে রেখেছিলাম। সেটা তুলতে গিয়ে মেঝের ওপর কি একটা জিনিস পড়ে রয়েছে মনে হ'ল। জিনিসটা তুলে আলোর নীচে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বেশ অবাক হলাম!

হাতীর দাঁতের খোদাই অপরূপ একটি ক্ষুদে মূর্তি। এসব জিনিসের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার আছে তাতেই বুঝলাম কোন উঁচুদরের চীনে কারিগর ছাড়া এমন জিনিস কেউ গড়তে পারে না। মাত্র এক বিঘৎ পরিমাণ মূর্তিটির সমস্ত অঙ্গ মায় চোখের ভুরু পর্যন্ত অপরূপ কৌশলে খোদাই করা। সাধারণ চীনে হাতীর দাঁতের মূর্তির মত কাল্পনিক কোন দৈত্য দানবের রূপ এটিতে নেই। সাধারণ একজন চীনে মজুর শ্রেণীর লোক পিঠে ঝোলা বেঁধে একটু নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত শুধু সেই ক্ষুদে মূর্তির চোখের চাহনি আর মুখের সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা ফোটানোর কায়দা।

মূর্তিটা যে চীনেম্যানই তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন করি কি ? যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে যাব, না জমা দেব পুলিশের জিম্মায়!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভই জয়ী হ'ল। এমন অপরূপ শিল্প-কৌশলের নিদর্শন চুরি করতেও বুঝি সত্যিকার সমঝদারের বাধে না। আমি ত ঠিক চুরিও করছি না।

মূর্তিটা সুটকেশের ভেতর ভরে আমি শেড থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সে মূর্তি আমি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনি। পথ থেকেই সে মূর্তি আমার হাত থেকে খোয়া গেছে। কেমন ভাবে আমি তা হারালাম সেই কথাই এবার বলি।

রাত্তির দুটোর ট্রেন আধঘন্টা লেট করে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল তখন বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে। সে বৃষ্টির ভেতর ভালো কামরা খোঁজ করবার উৎসাহ আর ছিল না। সামনে যে কামরা পেলাম তাইতেই উঠে কিন্তু খুশী হয়ে গেলাম। গাড়িটি একেবারে খালি। একটা বাঙ্ক দখল করে শুয়ে পড়লে এর পরে যত লোকই উঠুক, বাকি রাতটা ঘুমের ব্যাঘাত আর হবে না।

ঘুমোবার আয়োজন করবার আগে কিন্তু আর একবার মূর্তিটি বার করে দেখার কৌতূহল জয় করতে পারলাম না। ট্রেনের জোরালো আলোয় তার কারুকাজ ভালে করে দেখবার সুবিধে হবে বলে সুটকেশটা খুলে ফেললাম। কিন্তু কোথায় মূর্তি! সব জিনিসের ওপরে সেটিকে যে রেখেছিলাম সে কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। সুটকেশটি যে রকম জিনিসে ঠাসা তাতে নাড়াচাড়ায় ওলটপালট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও নেই।

তবু সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যও ওপরের কাপড়-চোপড়গুলো এক এক করে তুলে ফেললাম। সে মূর্তিটা আছে ঠিক, কিন্তু এভাবে সিল্কের রুমালটায় জড়িয়ে সেটাকে রেখেছিলাম বলে কোন মতেই স্মরণ করতে পারলাম না। অবশ্য তখন মাথার অবস্থা আমার খুব ভালো ছিল না। হয়ত বিমূঢ়তার মধ্যে এই ভাবেই রেখে থাকব মনে করে সিল্কের রুমাল খুলে সেটা বার করলাম।

ট্রেনের জোরালো আলোয় তার অপূর্ব কারুকার্য সত্যিই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু একটা খুঁতও সেই সঙ্গে দেখতে পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেডের ম্লান আলোয় এ খুঁতটুকু ধরা পড়েনি। চীনেম্যানের হাত থেকে অসাবধানে মেঝেয় পড়বার সময়ই বোধহয় মূর্তিটির মুখের বাঁ ধারে একটু চিড় খেয়ে গেছে। সামান্য একটু সূক্ষ্ম দাগ মাত্র, কিন্তু এমন মূল্যবান জিনিসের এইটুকু খুঁত থাকলেও মন ক্ষুণ্ণ হয়।

সযত্নে মূর্তিটিকে আবার সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সুটকেশের ভেতর তুলে রাখলাম। তারপর সুটকেশটি মাথার কাছে রেখে পুলিশের ফেরারী আসামী সাধারণ একজন চীনেম্যানের হাতে এমন দামী জিনিস কেমন করে এসে পড়েছিল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুমের ভেতর অস্পষ্ট ভাবে সেই চীনেম্যানকেই যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় সে যেন কি বলে আমায় শাসাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে সজোরে সে ঝাঁকুনি দিলে। ঘুমটা সহসা ভেঙে গেল।

সভয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি চীনেম্যান নয়, একজন ভদ্রলোক আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাচ্ছেন।

বিমূঢ়ভাবে উঠে পড়লাম। ট্রেণ একটা স্টেশনে এসে থেমেছে, বাইরে কুলি ও যাত্রীদের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের কথায় আমার কান গেল।

"কি রকম ঘুমোচ্ছেন মশাই! ট্রেনে এমন অসাবধানে ঘুমোয়!"

"কেন, কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না?"

দেখতে আমি সেই মুহূর্তেই পেলাম। আমার সুটকেশ খোলা, কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র তছনছ হয়ে কিছু বাঙ্কের ওপর কিছু কামরার মেঝেয় পড়ে আছে।

"টাকাকড়ি ছিল নিশ্চয়, দেখুন কি গেছে!"

টাকাকড়ি নয়, কি যে গেছে আমি সুটকেশের ওই অবস্থা দেখবামাত্র বুঝেছি। তবু দুরাশা করে সমস্ত কামরায় ছড়ান জিনিস-

পত্র ও সুটকেশ আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। না, সেই মূর্তিটা ছাড়া আর সব জিনিসই ঠিক আছে।

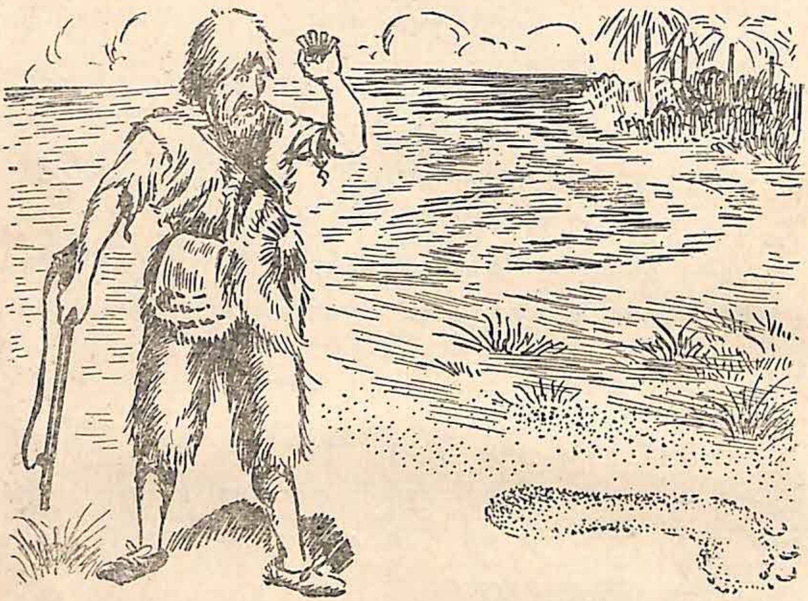
ভদ্রলোক আমার মুখ দেখে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"খুব বেশী কিছু ছিল বুঝি! স্টেশন মাস্টারকে খবর দিন এক্ষুনি!"

তারপর একটু থেমে কি ভেবে বললেন—"ঠিক হয়েছে! ট্রেন প্লাটফর্মে থামবার আগেই, একজন চীনেম্যান এই গাড়িটা থেকেই নেমে গেল বলে মনে পড়ছে এবার।"

"চীনেম্যান!"

"হ্যাঁ পিঠে একটা বোঁচকা সমেত। তখন অত খেয়াল করিনি। তারপর ঘরে ঢুকেই দেখলাম আপনার সুটকেসের এই দশা! ঈস্ তখন যদি আমারই বুদ্ধি হত। যাই হোক্ পুলিশে খবর দিন এই বেলা স্টেশন মাস্টারকে বলে!"

কিন্তু আমি সিল্কের রুমালটা হাতে নিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেই রইলাম। রুমালটার একধারে সামান্য একটুখানি রক্তের দাগ।



স্বর্গে হুলুস্থূল

স্বর্গে মহা হুলুস্থূল।

ইন্দ্র বরুণ আদি দেবতারা যেখানে থাকেন বলে শুনি সে স্বর্গে নয়। এ হল গল্পের স্বর্গ।

ভাবছ, গল্পের স্বর্গ আবার কী? বাঃ! গল্পের স্বর্গ আছে বৈকি! পৃথিবীর ছোট বড়, বড় ছোট, সকলের জন্যে যত ভালো গল্প এ পর্যন্ত যাদের নিয়ে লেখা হয়েছে তারা সব সেই স্বর্গে গিয়ে বাস করে। সেই স্বর্গে হুলুস্থূল কাণ্ড! যেদিকে ফেরা যায় তর্ক, বচসা, ঝগড়া! নেহাৎ স্বর্গ বলেই বোধহয় কথা কাটাকাটি মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না।

বিমল আর কুমারের অবশ্য এতে মজাই লাগছে, তারা নতুন এ-স্বর্গে এসেছে, একটা কিছু হুজুগ হলে তাদের ভালোই হয়। তাদের সঙ্গে জুটেছে টম সয়্যার আর হাকল্‌বেরি ফিন আর যত ডানপিটে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলের দল। বুদ্ধির ফোড়ন দেবার জন্যে আছে

দুষ্টুমির রাজা পিটার প্যান। লাগুক না একটা হৈ চৈ হুলুস্থুল—তা নাহলে স্বর্গের খাওয়া হজম হয়!

কিন্তু এত হুলুস্থুল কী নিয়ে? সেই কথাটাই বুঝি বলতে ভুলেছি। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে একটা পায়ের দাগ নিয়ে। তারপর অবশ্য অনেক দূর গড়িয়েছে।

স্বর্গের এলাকার বাইরে রবিনসন ক্রুসো সেদিন গেছলেন বেড়াতে। এরকম বেড়িয়ে বেড়ানো তাঁর স্বভাব, ছাগলের চামড়ার আলখাল্লাটি গায়ে দিয়ে সেকেলে মরচে-পড়া গাদা-বন্দুকটি নিয়ে তিনি খেয়ালমত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। স্বর্গে নইলে তাঁর মন টেঁকে না। সেদিন অমনি একা-একা কল্পনার সমুদ্রের ধারে অনেক দূর টহল দিয়ে ফিরছেন, এমন সময় দেখেন বালির ওপর একটি পায়ের দাগ। পায়ের দাগ দেখেই ক্রুসোর চক্ষুস্থির! এখানে এখন পায়ের দাগ হবার তো কথা নয়! এ দিকে তিনি ছাড়া আর কেউ কোনদিন ভুলেও আসে না। তবে এ কি তাঁরই পায়ের দাগ? না, তা-ই বা হবে কেমন করে! প্রথমত এ হল খালি পায়ের দাগ, তিনি তো আর খালি পায়ে কখনো ঘোরেন না। দ্বিতীয়ত, এ পায়ের দাগ যে অনেক বড়। একবার তাঁর মনে হয়েছিল হয়ত মৌগ্‌লি বা টারজানের পায়ের দাগ এটা হতে পারে। গল্পের স্বর্গে তিনি ছাড়া তারাই যা একা-একা ঘুরে বেড়ায়। পাও তাদের খালি থাকে। তবে, তারা নন্দনবনের ভেতরেই বেড়াতে ভালবাসে; সমুদ্রের তীর বড় পছন্দ করে না। তাছাড়া মৌগ্‌লি ও টারজানের চেয়েও এ পায়ের দাগ যে অনেক বড়। গোটা দশেক টারজানের পা এর ভেতরে ঢুকে যেতে পারে!

তবে? ক্রুসো এবার ভয়ে রীতিমত ঘেমে উঠলেন। গল্পের স্বর্গে কোনো অজানা শত্রু কি তাহলে হানা দিয়েছে! এত বড় যার পা, সে তো সামান্য কেউ কেটা নয়! স্বর্গের কি বিপদ আসন্ন কে জানে! হন-হন করে পা চালিয়ে ক্রুসো স্বর্গের দিকে ছুটলেন। খবরটা এখনি সেখানে দেওয়া দরকার।

সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে স্বর্গের ঘন জঙ্গল ; সেখানে বড়-বড় গাছের ডাল-পালা, শেকড়ে জংলি লতার কাঁটার জড়াজড়ি। তার ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া তো সোজা নয়! ভাগ্যক্রমে যদি টারজান কি মৌগ্‌লির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তাদের দিয়ে খবরটা তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা অনায়াসে চলাফেরা করে। জঙ্গলের রাস্তাই তাদের কাছে সোজা।

কিন্তু দেখা হবি তো হ একেবারে দুজনের সঙ্গেই একসঙ্গে। ওপরে গাছের ঝুরি ধরে ঝুলছে টারজান—নিচে নেকড়ে-ভাইদের নিয়ে চলেছে মৌগ্‌লি।

—কি খবর, মিঃ ক্রুসো? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

—কী ক্রুসো সাহেব, এত ব্যস্ত কেন?

ক্রুসো বললেন, 'খবর বড় খারাপ, তোমাদের একজনকে তাড়াতাড়ি একবার যেতে হবে স্বর্গে।' কিন্তু আর কিছু বলা আর তাঁর হল না।

'টারজান আবার খবর নিয়ে যাবে কী? ভারি তো ওর মুরোদ! ও তো আমার বাজে নকল!' বলে মৌগ্‌লি একেবারে খাপ্পা।

টারজান চটে গিয়ে বললে, 'ঈস, নকল বললেই হল! তুই তো নেকড়ের ছানা, থাকিস তো ভারি ভারতের জঙ্গলে! দেখেছিস আফ্রিকার জঙ্গল?'

মৌগ্‌লি জবাব দিলে, 'তুই তো গেছো বাঁদর! আর তোকে জঙ্গল আগে চেনালে কে শুনি?'

ক্রুসো বুঝলেন এদের দিয়ে কোনো কাজ আর হবার নয়, এদের আজন্ম রেষারেষি। সুতরাং কতক্ষণ এ-তর্ক আর চলবে কে জানে! তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন।

বন-জঙ্গল ভেঙ্গে স্বর্গের গেটে যখন পৌঁছলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে। গেটেই প্রভুভক্ত ফ্রাইডের সঙ্গে দেখা। মনিব তাকে বেড়াবার সময় যেদিন সঙ্গে নেন না, সেদিন সে এমনি করে তাঁর অপেক্ষায় গেটে দাঁড়িয়ে থাকে।

'শিগগির ফ্রাইডে, শিগগির স্বর্গের পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দাও!'

ফ্রাইডে তবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

ক্রুসো একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ! এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও কি তোমার বুদ্ধি খুলল না! যাও শিগগির!'

ফ্রাইডে থতমত খেয়ে বললে, 'আবার পাগলা ঘন্টি বাজাবো?'

'আবার মানে?'

'আজ্ঞে, খানিক আগে যে পাগলা-ঘন্টি বেজেছে! সবাই তো এখন তাই সভায়।'

পাগলা ঘন্টি বেজেছে! তার মানে? তিনি পৌঁছবার আগেই তাহলে শত্রুর খবর স্বর্গে সবাই পেয়ে গেছে! ক্রুসো হন্তদন্ত হয়ে সভার দিকে ছুটলেন। পেছনে ফ্রাইডে।

স্বর্গের সভায় আজ আর লোক ধরে না! স্বর্গ তৈরী হওয়া অবধি তো কোনোদিন এমন করে পাগলা ঘন্টি বাজেনি!

ক্রুসো অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলে সভায় ঢুকলেন। সভার মাঝখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্য দুধারে তালবেতালকে নিয়ে বসে আছেন, তাঁর এক পাশে হারুন-অল-রসিদ আর সিন্ধবাদ, আর একপাশে একটি আসন ক্রুসোর জন্যে খালি, তার পাশে গালিভার, ডার্টাগ্নান, অ্যাথস, আরামিস, পোর্থসকে নিয়ে বসে আছেন। তাছাড়া হোমরা চোমরা চুনোপুঁটি কেউই বাদ আছে বলে মনে হয় না।

নিজের আসনে গিয়ে ক্রুসো যখন বসলেন, তখন সিন্ধবাদ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে সভার আসল উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যায় না। তিনি নিজের সব ভ্রমণ-কাহিনী ফলাও করে বলতেই ব্যস্ত।

ক্রুসো পাশের দিকে ঝুঁকে গালিভারকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা কী বলুন তো?

'বাঃ, ব্যাপারটা আপনি শোনেন নি? আজ দুপুর থেকে অ্যালিসকে পাওয়া যাচ্ছে না যে! গেটের বাইরে কি কাজে বুঝি গেছল, তার পর থেকেই সে নিখোঁজ। স্বর্গে এমন ব্যাপার কখনো ঘটেনি ...... '

ক্রুসো আর কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না, তৎক্ষণাৎ

উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। অ্যালিসের অন্তর্ধান হওয়ার রহস্য বোধহয় তাতে কিছু পরিষ্কার হতে পারে।'

সিন্ধবাদ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ-রকমভাবে বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। রক পাখির ডিম কী করে ফুটল আমার এখনো বলাই হয়নি।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ফচকে ছেলে বলে উঠল, 'সে ডিমে ততক্ষণ আপনি তা দিন। আমরা কাজের কথা শুনতে চাই।'

সভায় একটা সোরগোল উঠল। বিক্রমাদিত্য নিজে উঠে গোল থামিয়ে সিন্ধবাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'ক্রুসোর কথা একটু শুনতে দিন। আমার বিশ্বাস অ্যালিসের অন্তর্ধানের সঙ্গে এ পায়ের দাগের কোন সম্বন্ধ আছে।'

তাঁর কথা শেষ না হতেই কাঁধে একটা টিয়াপাখি নিয়ে সদাশিবের মত ভালোমানুষ চেহারার একজন উঠে দাঁড়ালো। একটা পা তার কাঠের।

মধুর হেসে সবাইকে আপ্যায়িত করে সে বললে, 'আমি নেহাৎ সাদাসিধে বোকাসোকা লোক, কিন্তু সকলের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে অকারণে আমরা হৈ-চৈ করছি। অ্যালিসের অন্তর্ধান হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কে না জানে তার স্বভাব! আবার সে আয়নার পেছনেই যে গলে যায়নি, তা-ই বা কে বলতে পারে! আর মিঃ ক্রুসোর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, পায়ের দাগ দেখা তাঁর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মিছিমিছি এই ব্যাপার নিয়ে স্বর্গের শান্তি নষ্ট করবার কী দরকার?'

তার কথা শেষ না হতেই টম-সয়্যার বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো খোঁড়া সিলভার! তোমায় আমরা চিনি। তোমার মিষ্টি কথায় আর আমরা ভুলি না। অ্যালিসের ব্যাপারে তোমার কিছু হাত আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

কোথায় গেল সে সদাশিবের মত চেহারা! এক মুহূর্তে সিলভার একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের মূর্তি ধরল। পাশ থেকে অ্যালান

কোয়াটারম্যান ধরে না ফেললে কাঠের ঠেঙো দিয়ে সে বুঝি টমকে গুঁড়োই করে ফেলত!

এবারে হট্টগোল থামতে বেশ দেরী হল। বিমল আর কুমার এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত ব্যাপার দেখছিল। এইবার বিমল উঠে বললে, 'অ্যালিসের খোঁজ যদি করতে হয়, তাহলে সভা করে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ আমাদের আছে কি? মিঃ ক্রুসো যে পায়ের দাগ দেখেছেন, তা থেকে আমরা অনেক সন্ধান বোধহয় পেতে পারি।'

সিলভার ভেঙিয়ে বললে, 'কেমন করে শুনি?'

কুমার হেসে বললে, 'কেন, শার্লক হোমস কী করতে আছেন? পায়ের দাগ থেকে তিনি চেষ্টা করলে যার পা তার কুষ্টি-ঠিকুজি পর্যন্ত বার করে দিতে পারেন।'

সভায় গোল উঠল 'ঠিক, ঠিক! ডাকো শার্লক হোমসকে!'

তারই ভেতর একটি রোগাটে লম্বা ছোকরা উঠে বললে, 'আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। শার্লক হোমসকে ডাকবার দরকার নেই। আমি আর কর্তা এখুনি চললাম পায়ের দাগের খোঁজে। আজই অ্যালিসকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি।'

'ব্লেকের শাকরেদ স্মিথ না?' লিওর গুরু হলি হেসে বললেন, 'থাক বাবা থাক, তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই। অনেক কষ্টে স্বর্গে ঢুকেছ, একবার বেরুলে আর হয়ত ফিরতেই পারবে না।'

সকলে হেসে উঠল। টম বিমলকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বললে, 'কুৎসিত চেহারার ও রসিক বুড়োটা কে হে?'

'বাঃ, ওকে চেন না!' আফ্রিকার মাঝখানে পাঁচ হাজার বয়সী আয়েশাকে ও-ই তো লিওর সঙ্গে খুঁজতে গেছল। পড়নি 'শী'র গল্প?'

ক্রুসোর সঙ্গে হোমসকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে স্বর্গের হোমরা-চোমরা সবাই এসেছেন পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে। শার্লক হোমস অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে সে দাগ পরীক্ষা করে বললেন, 'কী বুঝলে ওয়াটসন?'

টাক-মাথা নিরীহ চেহারার একটি লোক অত্যন্ত ভক্তিভরে এতক্ষণ

হোমসের সব কাজ লক্ষ্য করছিলেন। বিনীতভাবে তিনি বললেন, 'আমি কী বলব বল! যা বলব, তুমি তো সব পালটে দিয়ে আমায় বোকা বানিয়ে ছাড়বে। তার চেয়ে আমার চুপ করে থাকাই ভালো।'

হোমস একটু হাসলেন, 'সে মন্দ কথা নয়। তারপর সকলের দিকে ফিরে বললেন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।'

'কী, দেখলেন কী?' সবাই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন।

'দেখলাম একটা পায়ের দাগ।'

'আহা! সে তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি।'

'কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না! শার্লক হোমস বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা চেহারা? দেখতে পাচ্ছেন গায়ে তার ভালুকের মত লোম? দেখতে পাচ্ছেন বিকট দাঁতাল তার গরিলার মত মুখ? দেখতে পাচ্ছেন হাতের তেলোয় তার অ্যালিস বসে কাঁদছে? দেখতে পাচ্ছেন……'

একজন বাধা দিয়ে বললে, 'আপনি এইসব দেখতে পাচ্ছেন?'

'এইসব কেন, আরো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তার মনে কী ঝড় বইছে, বুঝতে পারছি কী সে চায়।'

'কী চায়?'

'চায় স্বর্গে ঢুকতে, স্বর্গের একজন হতে।'

'স্বর্গের একজন হতে চায়! কে সে?' গালিভার মাথা চুলকে বললেন, 'ব্রবডিগন্যাগ্-এ সবাই এরকম পঞ্চাশ ফুট লম্বা হয় দেখেছি, কিন্তু তাদের গায়ে তো লোম নেই, গরিলার মত চেহারাও তাদের নয়!'

বিমল বললে, 'হিমালয়ের পাহাড়ে, সুন্দরবনের জঙ্গলে, আমরাও অনেক দানবদের পাল্লায় পড়েছি, কিন্তু তাদের সঙ্গেও তো বর্ণনায় মিলছে না!'

হঠাৎ কুমার চীৎকার করে উঠল—'বুঝেছি, বুঝেছি!'

'কী বুঝেছ ছোকরা?' হোমস জিজ্ঞাসা করলেন।

'এ আর কেউ নয়, কিং কং।'

'কিং কং! সে আবার কে?'

'সে আছে একজন, গরিলা আর মানুষ আর দানব মিলে তৈরি। নিউইয়র্কে গিয়ে ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। তার বায়োস্কোপ হয়েছে।'

ডার্টাগ্নান, অ্যাথস, আরামিস, পোর্থস সবার আগে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'ও বায়োস্কোপ-ফায়োস্কোপ বুঝি না। মাথামুণ্ডু হয় না, আজগুবি যাকে তাকে স্বর্গে স্থান দেওয়া কিছুতেই হতে পারে না। স্বর্গের তাহলে আর মর্যাদা রইল কিসের! একবার গেট আলগা করলে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে ঢোকাবো? ভিড়ের চোটে আমাদেরই তো জায়গা হবে না।'

'কিন্তু অ্যালিসের উদ্ধার তো দরকার! অ্যালিসকে স্বর্গে ঢোকবার জন্যেই যে চুরি করেছে!' মাস্টারম্যান রেডি একটু থেমে বললে।

মহা সমস্যার কথা! সকলেই সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। স্বর্গের দরজা বন্ধ করলে অ্যালিসকে ফিরে পাওয়া যায় কী করে!

এবার ডার্টাগ্নান তলোয়ার খুলে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন মাস্কেটিয়ার বন্ধু, 'আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি অ্যালিসকে উদ্ধার করতে। মানুষের সঙ্গেই আমরা কারবার করেছি বটে চিরদিন, আজগুবি দানবের সঙ্গে নয়, তবু আমরা ডরাই না। স্বর্গের মান আমরা রাখবই!'

বিমল ও কুমারও এগিয়ে এল, সঙ্গে টম সয়্যার, হাকলবেরি ফিন, আরো অনেকে—'আমরাও ডরাই না, অনেক বিপদ আমরা তুচ্ছ করেছি, অনেক দৈত্য-দানবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে!'

কিন্তু এসব আস্ফালন কোন কাজে লাগল না। হঠাৎ বনের মাথা ছাড়িয়ে এক বিরাট মূর্তি দেখা দিল। চার ধাপে মাইল খানেক পথ পেরিয়ে এসে সে মূর্তি তাদের কাছে থেমে, হাতের তেলো থেকে অ্যালিসকে বালির ওপর নামিয়ে দিলে। তারপর বললে—

'এই নাও তোমাদের অ্যালিস! বাব্বাঃ, ঐ একরত্তি মেয়েকে সামলাতে আমার জান বেরিয়ে গেছে! মেয়ে নয় তো, যেন পুলিশ কোর্টের গোটা বার লাইব্রেরি! মেশিন-গানের গুলি খেয়েছি, কিন্তু

ওর জেরার চোটে তার চেয়ে বেশি ঝাঁঝরা হয়ে গেছি! —কে তুমি, কোথাকার তুমি, কেন তুমি—কত জবাব দেওয়া যায়!'

খানিকক্ষণ কারুর মুখে আর কথা নেই। অবশেষে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তাহলে স্বর্গে তুমি আর যেতে চাও না?'

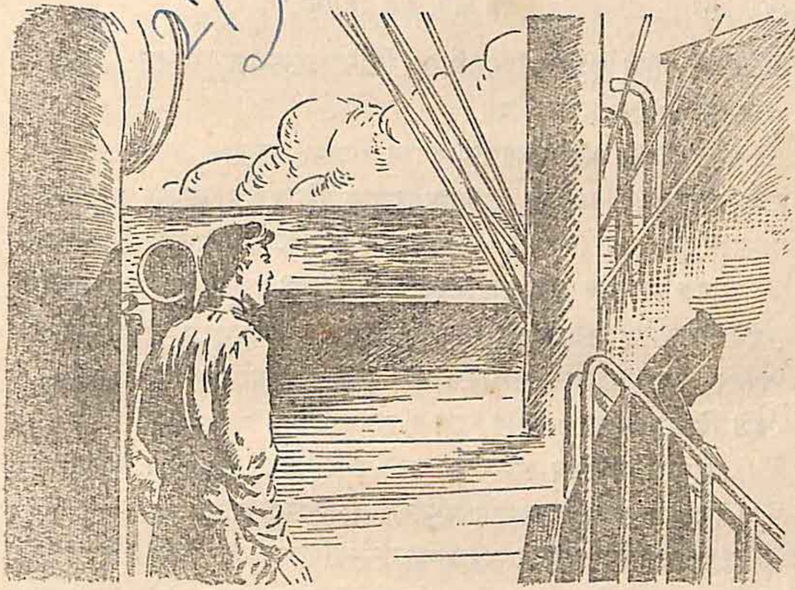
'ছোঃ! তোমাদের স্বর্গ আমি বুঝে নিয়েছি! আর আমার তাতে কোন রুচি নেই। সেখানে আমার যুগ্যি আছে কে? মাথা হেঁট করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেই তো ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে! তাছাড়া ও নির্বংশ পুরীতে আমি থাকতে চাই না।'

'তার মানে?' হারুণ-অল-রসিদ জিজ্ঞাসা করলেন।

'তার মানে, তোমরা সবাই তো আঁটকুড়ো, এক পুরুষেই শেষ! আর আমার ছেলে ইতিমধ্যেই লায়েক হয়ে উঠেছে, তারপর তার নাতি, নাতির নাতি যে হবে না কেউ বলতে পারে? এমনকি একটি নাৎনিরও সম্ভাবনা আছে। তাদের নিয়ে আমি নিজের স্বর্গ নিজেই করে নেব।'

'তা বেশ, তা বেশ!'

স্বর্গের সবাই হাঁফ ছেড়ে বললেন।



ভুতুড়ে জাহাজ

আবার সেই মূর্তিটাকে দেখলাম।

রাত তখন ঠিক বারোটাই হবে।

ওপরের ডেকে এতক্ষণ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ভারত সমুদ্রের রাত্তিরের শোভা দেখছিলাম।

জাহাজে মাঝ রাতের পাহারাকে বলে মিড্‌ল ওয়াচ। সে পাহারা সুরু হয় ঠিক বারোটায়।

মিড্‌ল ওয়াচের ঘণ্টা তখনো বাজেনি।

তবু বারোটা বাজতে আর যে বড় জোর মিনিট খানেক আছে জাহাজের সেকেণ্ড মেট মিঃ অগডেনকে আসতে দেখেই নির্ভুল ভাবে বুঝলাম।

সেকেণ্ড মেট হিসাবে অগডেনের ওপরই মিড্‌ল ওয়াচের ভার।

লোকটি মানুষ নয় যেন যন্ত্র। সব কিছু নড়া চড়া তাঁর ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। শুধু ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল নিয়মে বাঁধা তিনি নন।

জাহাজের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি একেবারে জীবন্ত বিশ্বকোষ আর গণিতশাস্ত্র বললেই হয়।

সমুদ্র যখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা, একটি তারাও আকাশে দেখা যায় না, তখন জাহাজ কোথায় আছে কি বেগে চলেছে সব তিনি অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা ধরে একেবারে নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারেন।

ভারত সমুদ্রের জাহাজে ভাসতে ভাসতেই সুদূর চীনের সাংঘাইতে কখন চাঁদ উঠছে তিনি বলে দেবেন। উত্তরমেরু অঞ্চলের স্পিটজ্‌বার্জেন অঞ্চলে সমুদ্র বছরের ঠিক কোন সময়টায় জমে বরফ হয়ে যায় তাও কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে দিতে পারেন।

এমনিতে অগডেন একেবারে মাটির মানুষ। শুধু একটি ব্যাপারে তাঁর ক্ষিপ্ত রুদ্র মূর্তি কখনো কখনো নাকি দেখা যায়।

জাহাজের কম্পাসের ধারে কাছে নাবিকদের কেউ যদি ভুলে ছুরি কাঁচি গোছের কিছু ফেলে যায় তাহলেই আর রক্ষে নেই। অগডেন একেবারে ক্ষেপে আগুন।

অগডেনের সেই আগুনের মত জ্বলে ওঠা চেহারা দেখার সঙ্গে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান জানবার ভাগ্য এ যাত্রায় আমার হবে। আগে ভাবতেও পারিনি।

অগডেন আমায় গুডনাইট জানিয়ে সামনে চলে যাবার পর কেবিনে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

ওপরের ডেক থেকে কেবিনে যাবার সিঁড়ির কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

সিঁড়িটা নিচের ডেকের করিডরে গিয়ে নেমেছে। সেই করিডরের পাশেই আমাদের কেবিন।

করিডরটা তখন প্রায় অন্ধকার। সেই আবছা আলোতেই মূর্তিটাকে দ্রুতপদে করিডরের অন্য প্রান্তে চলে যেতে দেখলাম।

থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই পড়ি কি মরি অবস্থায় নিচে নেমে গেলাম।

কিন্তু কোথায় সে মূর্তি!

সমস্ত করিডরটা একবার ঘুরে এলাম। ডেকে দুটি মাত্র ফার্স্ট ক্লাস কেবিন। তার একটিতে আমরা আর একটিতে স্বয়ং ক্যাপটেন থাকেন।

করিডরটা শেষ হয়েছে গিয়ে নিচে জাহাজের খোলে যাবার সিঁড়িতে। সেখানেই মালপত্র বোঝাইএর গুদাম, ইঞ্জিন ঘর আর নাবিকদের থাকবার জায়গা।

সেখানে এরকম অদ্ভুত মূর্তি লুকিয়ে থাকা ত' অসম্ভব।

অথচ লুকিয়ে না থাকলে এ মূর্তি জাহাজে উপস্থিত থাকে কি করে?

আবছা অস্পষ্ট গোছের দেখালেও মূর্তিটা একটি মেয়ের। গায়ের পোশাকটা মিশ কালো আর মুখের ওপর যেন শাদা কুয়াশার ঢাকনা।

সত্যিই অশরীরী কিছু যদি না হয় তাহলে একজন মেয়ের পক্ষে এ জাহাজে কোথাও সকলের চোখ এড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

দুদিন আগে বন্দর থেকে এ জাহাজ ছেড়েছে। জাহাজ যেদিন ছাড়ে সেইদিনই এমনি গভীর রাত্রে মেয়েটিকে নিচের ওই করিডরেই দেখতে পাই।

আজকের মত সেদিন ওপরের ডেক থেকে নিচে নামছিলাম না। রাত্রে কিছুতেই ঘুম না আসায় ওপরের ডেকে যাবার জন্যে কেবিন থেকে বার হচ্ছিলাম।

দরজা খুলতেই করিডরের অন্য প্রান্তে ওই মেয়ের মূর্তিটি দেখতে পাই। আমায় দেখতে পেয়েই সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচের খোলে নেমে যায়।

এ জাহাজে তখন প্রথম উঠেছি। যাত্রী আর কে আছে না আছে জানি না। তাই সেরকম কিছু বিচলিত না হলেও একটু অবাক বোধ করেছিলাম। জাহাজটা নেহাৎই মাল-বওয়া ট্র্যাম্প স্টীমার। যাত্রী সাধারণত এ জাহাজে থাকে না বললেই হয়। বন্দর থেকে জাহাজে ওঠবার সময় অন্তত কোনো মেয়ে যাত্রীকে দেখিনি।

পরের দুপুরে খাবার টেবিলে বসে সেই কথাটাই তুলেছিলাম। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বলে ক্যাপটেনের সঙ্গে এক টেবিলে আমাদের

খেতে বসবার ব্যবস্থা। যাঁকে দেখেছি তিনি আমাদের মত যাত্রী হলে তাঁরও জায়গা এই টেবিলে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে খাবার টেবিলে ত নয়ই, ষ্টীমারেও কোথাও দেখিনি।

সেই কথাটা পাড়বার জন্যেই ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ জাহাজে আর কোন যাত্রী আছেন কি না।

আর কোন যাত্রী!—ক্যাপটেন ডিগ্‌বি অবাক হয়ে বলেছিলেন, আর কোন যাত্রী কোথা থেকে আসবে! এ জাহাজে যাত্রী কেবিন ত মাত্র একটি, যাতে আপনারা আছেন।

না, একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলাম,—এই ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া আর অন্য ক্লাসের যাত্রী ত থাকতে পারেন!

না, মশাই না!—ডিগ্‌বি বলেছিলেন—ফার্স্ট সেকেণ্ড কোন ক্লাসের কোন কেবিন আর নেই। আমাদের এ জাহাজে যাত্রীই নেওয়া হয় না। বড় লাইনের ভালো জাহাজ থাকতে এ রদ্দি জাহাজে যাত্রী হতেই বা চাইবে কে! নেহাৎ আপনাদের অদ্ভুত সখ আর এ জাহাজের মালিক আফ্রিকা ট্রেডার্সএর সঙ্গে মগনলাল ব্রাদার্সের কাজ কারবার আছে বলে তাদের সুপারিশের চিঠিতে আপনাদের জন্যে এই কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নইলে এ কেবিন বেশীর ভাগ খালিই থাকে, কখনো সখনো কোম্পানির কর্তাদের কেউ ইনস্পেকশনে এলে ও কেবিনে থাকেন।

ক্যাপটেনের কথা শেষ হবার পর নিজের সংশয়টা ব্যক্ত না করে পারিনি। বলেছি—তাহলে বুঝতে হবে আমরা আর আপনার জাহাজের ক্রু ছাড়া আর কেউ এ জাহাজে নেই। কিন্তু আমি যে কাল রাত্রে একজন মহিলাকে আমাদের কেবিনের বাইরের করিডরে দেখেছি!

একজন মহিলাকে!

রাত্রে করিডরে!

ক্যাপটেন ও মামাবাবু দুজনেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন।

তারপর মামাবাবুর মুখেই একটু টেপা হাসি দেখা দিয়েছিল। বলেছিলেন—ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখিস নি ত!

স্বপ্ন! আমি জ্বলে উঠেছি মামাবাবুর ওপর—কাল রাত্রে তখনও পর্যন্ত আমার ঘুমই আসেনি। তুমি অবশ্য তখন নাক ডাকাচ্ছ কুম্ভকর্ণের মত। ওপরের ডেকে যাবার জন্য দরজা খুলতেই ওই মহিলাকে করিডরের অন্য প্রান্তে দেখতে পাই। আমায় দেখেই সিঁড়ি দিয়ে তিনি নিচে নেমে যান।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব মিঃ হাজরা! ডিগ্‌বির গলায় কিন্তু কৌতুকের বদলে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য—প্রথমতঃ এ জাহাজে কোন মহিলা থাকতেই পারেন না, সিঁড়ি দিয়ে নিচে তিনি যাবেনই বা কোথায়? নিচে কি আছে আপনাদের ত কাল দেখিয়েই এনেছি। সেখানে একজন মহিলার থাকবার জায়গা কোথায়!

একটু চুপ করে থেকে ডিগবি আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, আচ্ছা মহিলার চেহারাটা কি রকম বলবেন?

একটু বিব্রত বোধ করে বলেছি—চেহারা ওই আবছা অন্ধকারে দূর থেকে কি ভালো দেখতে পেয়েছি! তবে পাৎলা লম্বা কমবয়সী কেউ বলেই মনে হয়েছে। জ্যাকেট আর স্কার্ট পরা। মাথায় তার সঙ্গে একটা 'বেরে' ছিল এবিষয়ে ভুল নেই। প্রথমটা হঠাৎ তাই যেন মেয়ে অফিসার-টফিসার বলে ধারণা হয়েছিল।

মাথায় 'বেরে' পরা মেয়ে-অফিসার!—বলে এবার ক্যাপটেন হেসে ফেলেছেন—না মশাই, আমাদের ট্র্যাম্প জাহাজে এখনো মেয়ে অফিসার নেওয়ার রেওয়াজটা চালু হয়নি। কালে কালে হয়তো সবই হবে। তবে তার আগেই আমার জাহাজ ছেড়ে অবসর নেবার সময় হয়ে যাবে, এই বাঁচোয়া।

হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া আমার মনঃপূত হয়নি। একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছি—জেগে স্বপ্ন দেখার রোগ কিন্তু আমার নেই, মিঃ ডিগ্‌বি। এ রহস্যের একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। একজন অল্পবয়স্কা ইউরোপীয়ান মহিলাকে কাল যে আমি করিডরে দেখেছি, তা আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি।

সত্যিই ব্যাপারটা ত' তাহলে অদ্ভুত! মামাবাবু আমায় একটু

যেন সমর্থন করেছেন—আচ্ছা, জাহাজে অনেক সময়ে বিনা খরচে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা ত' কেউ কেউ করে। সেই রকম কোন 'স্টো-অ্যাওয়ে' নয় ত'!

ক্যাপটেন এ কথায় সামান্য যেন চিন্তিত হয়েছেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ সূপের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন—স্টো-অ্যাওয়ে আমার এই মাল জাহাজে! তাও আবার মেয়েছেলে!

মামাবাবুর দিকে সোজা এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছেন—বিশ্বাস করতে মন চায় না, মিঃ সেন। এই ষ্টীমারে স্টোঅ্যাওয়ে কি সুখে থাকতে চাইবে! আর মিঃ হাজরা যা বর্ণনা দিচ্ছেন সেরকম যুবতী একটি মেয়ে লুকিয়ে থাকবে কোথায়! এ ত আর সমুদ্রে প্রাসাদের মত বিরাট প্যাসেঞ্জার-জাহাজ নয়, যার নানা কোণ কানাচ আছে লুকিয়ে থাকবার। তবু সন্দেহ যখন জেগেছে, তখন ভালো করে একবার তল্লাস করে দেখব।

প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ হয়েছিল। রাত্রে ডিনারের সময় ক্যাপটেন আমাদের জানিয়েছেন যে, ষ্টীমারটা যত দূর সাধ্য তিনি প্রায় তন্ন তন্ন করেই খুঁজিয়েছেন, কোথাও কোন স্টোঅ্যাওয়ে ত' পাওয়া যায়নি।

কথাটা মিঃ ডিগ্‌বি এমন সুরে বলেছিলেন যে, মামাবাবু ও আমি দুজনেই একটু সন্দিগ্ধ ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম।

মামাবাবুই বলেছিলেন—আপনার নিজের মনে যেন একটু সন্দেহ জেগেছে, ক্যাপটেন! কিছু যেন চেপে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে!

না, চেপে যাইনি। ডিগ্‌বি একটু ইতস্ততঃ করে বলেছেন,—যে সামান্য ব্যাপারে আমার একটু ধোঁকা লাগছে, সেটা আপনাদের বলব কি না তাই ভাবছিলাম। ব্যাপারটা সত্যিই হয়ত কিছু নয়।

কিছু যদি না হয় তাহলেও বলতে দোষ কি!—আমি কথাটা বার করতে চেয়েছি।

দু' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ডিগ্‌বি বলেছেন—খোঁজ করে স্টো-অ্যাওয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি, শুধু আমাদের একজন এ বি, দু'

নম্বর হোল্ডে একটা 'বেরে' টুপি পেয়েছে। 'বেরে' টুপিতে কিছুই অবশ্য প্রমাণ হয় না। ও টুপি সাধারণতঃ পুরুষরাই পরে। আমাদের জাহাজে কাজ করে ত্রিশ জন। তাদের কারুরই ওটা হওয়া সম্ভব।

শেষের কথাগুলো ডিগ্‌বি যেন নিজেকে স্তোক দেবার জন্যেই বলেছেন। তেমন জোর দিয়ে বলতে পারেন নি।

মামাবাবু তাই বোধ হয় বলেছেন—টুপিটা কার তা কিন্তু জানা যায় নি, কেমন ?

না, সেইটেই মজা! ক্যাপটেন স্বীকার করে নিজের ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন—খোঁজাখুঁজি দেখে যার টুপি সে বোধ হয় ভড়কেই মালি-কানাটা চেপে গেছে।

ক্যাপটেনের এ কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মামাবাবু বলেছেন—আচ্ছা, টুপিটা কে পেয়েছে বললেন ?

বিল মার্ফি। একজন এ বি।—বলেছেন ক্যাপটেন।

এ বি মানে এবল্ সীম্যান ত!—মামাবাবু নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, —তার মানে ও এস অর্থাৎ অর্ডিনারী সীম্যান হয়ে অন্ততঃ তিন বছর কাজ করেছে, কেমন ?

ঠিক ধরেছেন। হেসে বলেছেন ডিগ্‌বি, আপনি ত জাহাজের খুঁটিনাটি জানেন দেখছি।

জানি আর কতটুকু।—মামাবাবু বিনয় করেছেন—এই জাহাজে উঠেই কিছু কিছু শিখেছি। সে কথা থাক। এই বিল মার্ফি দু নম্বর হোল্ডের কোথায় টুপিটা কি ভাবে পেয়েছে জিজ্ঞেস করেছেন ?

করেছি বই কি! ডিগ্‌বি বলেছেন—দু নম্বর হোল্ডে এখন বলতে গেলে কিছুই নেই। এক ধারে গাদা করা কিছু চটের থলে পড়ে আছে। সেই চটের থলের মধ্যে কারুর লুকিয়ে থাকবার জায়গা নেই। সেখানে খোঁজ করবারও কথা নয়। তবুও নিজে থেকে সে থলেগুলো নাড়তে গিয়ে ওই 'বেরে'টা পায়।

মার্ফিকে তাহলে খুব উৎসাহী বলতে হবে।—বলেছেন মামাবাবু।

হ্যাঁ, তা একটু উৎসাহী! স্বীকার করেছেন ক্যাপটেন—কিন্তু একটু

বেয়াড়াও বটে। ফার্স্ট মেট পার্কার ত ওকে ওই থলেগুলো ঘাঁটতে দেখে চটেই গেছলেন।

তাই নাকি।—মামাবাবু একটু হেসেছেন—তাহলে মার্ফি বেয়াড়া না হ'লে ও 'বেরে'টাও ত পাওয়া যেত না। যদিও 'বেরে'র কিছু মানে আছে কি না, সেইটেই বলা শক্ত।

হ্যাঁ, ডিগ্‌বি আমার দিকে একটু যেন অপ্রসন্ন ভাবেই চেয়ে বলেছেন—মিঃ হাজরা এমন একটা ফ্যাক্‌ড়া তুলেছেন যা বিশ্বাসও করতে পারছি না, আবার উড়িয়ে দিতেও।

এ বিষয়ে আর কিছু কথা তখন হয়নি।

তারপর এখন আবার সেই মূর্তিকে ক্ষণেকের জন্যে দেখে নিচের সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে খোঁজবার চেষ্টা আর করলাম না। করিডর থেকে সোজা নিজেদের কেবিনে ঢুকলাম।

মামাবাবু অবশ্য তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এই পরম বিলাসের ঘুম ভাঙালে তাঁর মেজাজ কি হবে জানলেও আজ আর দ্বিধা করলাম না। দু' চারবার মুখে ডেকে সাড়া না পেয়ে কাঁধ ধরে সজোরে নাড়া দিলাম।

মামাবাবুর ঘুম কি তাতেই ভাঙবার! আরো দুবার নাড়া দিয়ে ডাকবার পর অতিকষ্টে চোখ মেলে বিরক্তি জড়ানো স্বরে বললেন—কেন জ্বালাতন করছিস! রাত ত মোটে নটা।

নটা নয় বারোটা, আমি রেগে বললাম, কিন্তু সে কথা নয়। এই মাত্র সেই মেয়েটিকে আবার দেখেছি।

আবার!—মামাবাবু এবার ধড়মড় করেই বিছানায় উঠে বসলেন, —কোথায়?

বিবরণটা দিলাম। মামাবাবু তাতে অত উত্তেজিত হবেন আমিও সত্যি ভাবিনি। বিছানা থেকে উঠে পড়ে স্লিপিং সুট পরা অবস্থাতেই ক্যাপ্‌টেনের কেবিনে গিয়ে ধাক্কা দেওয়ায় আমি তখন একটু অপ্রস্তুত।

ক্যাপ্‌টেন এমনিতে ভালো মানুষ, কিন্তু এরকম আচমকা মাঝরাত্রে

ঘুম ভাঙালে কি মেজাজ নিয়ে বার হবেন কে জানে! আমি তাই পরের দিন সকালেই ব্যাপারটা জানাতে চেয়েছিলাম।

আমাদের ভাগ্য ভালো। ক্যাপটেন তখনও ঘুমোননি। ঘুমোবার আগে একটু মৌতাত করেছিলেন। ভুরু কুঁচকে বেরিয়ে এলেও আমাদের দেখে জ্বলে উঠলেন না।

ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোনবার পর তাঁর মুখও রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন,—না, আর হেলাফেলা করার ব্যাপার এ নয়। এখুনি নিচে গিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া দরকার।

একজন ও. এস.কে ডেকে আমাদের কেবিনের কাছে পাহারায় দাঁড় করিয়ে আমরা সবাই নিচে গেলাম। খোঁজাখুঁজি কিন্তু সবই বৃথা! ইঞ্জিন ঘর থেকে নাবিকদের কেবিন আর সমস্ত হোল্ড যথাসম্ভব সন্ধান করে কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। নিজের দেখাই অভ্রান্ত কি না সে বিষয়ে আমার তখন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। নাবিকদের ভাবভঙ্গি ত আমাদের ওপর বেশ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের। ক্যাপটেন স্বয়ং এবার উৎসাহী না হ'লে তাদের দিয়ে খোঁজাখুঁজি করানই যেত না বোধহয়।

ফার্স্ট মেট ত স্পষ্টভাবে নিজের বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেললেন। ফার্স্ট মেট ও 'বেরে' যে পেয়েছে সেই বিল মার্ফির সঙ্গে মামাবাবু একটু আলাদা আলাপ করতে চেয়েছিলেন। ক্যাপটেন হুকুম দিয়েছিলেন সেই মত।

প্রথম ফার্স্ট মেটের কেবিনেই গেলাম। আমাদের বসতে পর্যন্ত না বলে তিনি একটা পাইপ ধরাতে ধরাতে গোমড়া মুখে যা বললেন তা অপমানেরই সামিল।

আপনারা কোথাকার পুলিশ জানতে পারি? এরকম চেহারায় পুলিশ আগে কখনো দেখিনি কি না তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মামাবাবু এক মুহূর্তে আর এক মূর্তি। সমান মেজাজে কড়া গলায় বললেন, আমরা প্রশ্ন করতে এসেছি। শুনতে নয়। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি না বলুন!

ফার্স্টমেটের চেহারা তখন দেখবার মত। রাঙা মুখ তখন আরো লাল হয়ে উঠেছে রাগে। ষণ্ডা গণ্ডা দৈত্যের মত দেহখানা। একটা ঘুসি চালালেই আমরা আর নেই।

ফার্স্টমেট কিন্তু আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলালেন। পাইপটা মুখে দিয়ে চাপা দাঁতের জড়ানো স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কি আপনাদের প্রশ্ন?

প্রশ্ন শুধু একটা।—মামাবাবুর গলা এখনও রুক্ষ—এই মারমেড জাহাজে কতদিন কাজ করছেন?

কি একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও ফার্স্টমেট যে থেমে গেলেন তা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। একটু চুপ করে থেকে মুখ থেকে পাইপটা বার করে বললেন, একমাস মাত্র।

হুঁ, তাই ভেবেছিলাম, ধন্যবাদ।—বলে মামাবাবু পেছন ফিরে আমাকে নিয়ে সোজা ওপরে আমাদের কেবিনে।

মামাবাবুর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিনি। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই, দরজার বাইরে টোকার সঙ্গে ভারী গলার আওয়াজ পেলাম—আসতে পারি।

আসুন।—বললেন মামাবাবু।

ভেতরে যে ঢুকল ভারী গলার আওয়াজের সঙ্গে চেহারায় তার মিল নেই। রোগাটে পাৎলা কমবয়সী ছোকরা। পরিচয় সে নিজেই দিলে—আমার নাম বিল মার্ফি। ক্যাপটেন পাঠিয়েছেন। আপনারা কি জানতে চান সেই জন্যে।

রোগা পাৎলা ছোকরা হলেও মার্ফির মেজাজটা ফার্স্টমেটের চেয়ে বিশেষ মোলায়েম নয়। কথাগুলো কাটা-কাটাই লাগল। তার কারণটা অবশ্য আলাদা, একটু পরে বুঝলাম!

মামাবাবু মার্ফিকে বসতে বললেন, কিন্তু জাহাজের আদব কায়দার দরুনই বোধ হয় সে বসল না।

মামাবাবু মার্ফির বেলায় কিন্তু ভোল পাল্টে মিষ্টি করে হেসে বললেন—তুমিই ত 'বেরে' টুপিটা পেয়েছ? কেমন?

মামাবাবুর মিষ্টি হাসি আর গলাতেই কাজ হবে ভাবি নি। মার্ফি প্রায় কাঁদুনে গলায় মামাবাবুর কাছেই তার ক্ষোভ জানালে—পাওয়াটাই যেন আমার অপরাধ হয়েছে, জানেন! বারণ করা সত্ত্বেও থলেগুলো ঘেঁটেছি বলে আমার ওপর কি সব তম্বী।

কে, তম্বী করল কে!—মামাবাবু হেসে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই ফার্স্ট মেট ?

ফার্স্ট মেট মুখে করেছেন। মার্ফি বললে—মনে মনে আরো অনেকেই খাপ্পা।

আরো অনেক কারা! ক্যাপটেনও ?—আমিই জিজ্ঞাসা করলাম।

না, না।—মার্ফি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানালে—উনি অত্যন্ত ভালো। কিন্তু ওঁর নাকের তলা দিয়ে কি হয়ে যায় সে উনি জানবেন কি করে ?

যেমন এ জাহাজে মেয়ে লুকিয়ে থাকা ?—মামাবাবু মার্ফিকে উসকানি দিলেন।

তা মেয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব কি! এই আমিই ত—

সরলভাবে অতখানি বলে ফেলে মার্ফি যেন ভয় পেয়েই থেমে গেল।

তোমার কিছু ভয় নেই।—মামাবাবু তাকে সাহস দিলেন—ক্যাপটেন তোমার সহায় তা ত জানো। মোম্বাসা থেকে জাহাজ ছাড়বার পর তুমি নিজে এরকম কিছু দেখছ ?

আমি···আমি—একটু থতমত খেয়ে মার্ফি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে ফেলল—আমিও এই পরশু রাত্রে ওপরে ফোকাস্‌ল-এর কাছে ওই রকম মূর্তি যেন দেখেছিলাম। সেটা আলোছায়ায় আমার মনের ভুলই বলে ধরে নিয়েছিলাম অবশ্য।

তাই কাউকে আর সে কথা জানাও নি, কেমন ?

ক্যাপটেন কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার ভেতরে এসে মার্ফিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মার্ফি সেলাম জানিয়ে চলে যাবার পর চিন্তিত মুখে বললেন—ব্যাপারটা তাহলে ভৌতিক বলেই ধরে নেব, মিঃ রায় ? সেরকম একটা বদনাম অবশ্য আছে আমাদের 'মারমেড'-এর।

সে বদনাম কাটান এবার দরকার নয় কি?—মামাবাবু বললেন।

যদি পারেন ত আপনার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ থাকব। ক্যাপটেন উৎসুকভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালেন—মেয়েটি যেই হোক, সত্যি যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারেন!

তাকে খোঁজার চেয়ে, কেন সে দেখা দেয় সেইটে বোঝাই বেশী দরকার নয় কি?

ক্যাপটেন ও আমি দুজনেই একটু অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম।

আরম্ভটা যেন ভৌতিক কাহিনীর ভূমিকা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। সেরকম কিছু লিখতে কিন্তু বসিনি। এ ধরনের অলৌকিক গোছের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ব, তা জানতাম না। মামাবাবু তা নিশ্চয় ভাবতে পারেননি! সুযোগ পেয়ে নেহাৎ খেয়ালের মাথায় এই সুদূর সমুদ্রের রাজ্যে তাঁর বেড়াতে আসা। সেই সঙ্গে প্রলোভন দেখিয়ে আমাকেও টেনে এনেছেন।

সুযোগটা হয়েছিল মগনলাল ব্রাদার্সের এক অংশীদার সুন্দরদাস মগনলালের মামাবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসা থেকে। মগনলাল ব্রাদার্স আমদানি-রপ্তানির কারবারী। বোম্বাই, করাচি ও কলকাতা থেকে তখনকার দিনে তাঁরা বিদেশে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট চালান দেন। সমুদ্র পার থেকে যা আমদানি করেন, তার একটা হল গুয়ানো, অর্থাৎ পাখীদের যুগযুগান্তরের জমানো মল, সার হিসেবে যার জায়গায় আজকাল কৃত্রিম ফার্টিলাইজার চলছে।

এই গুয়ানো তাঁরা আনেন আফ্রিকার পূর্ব দিকের ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের উত্তরে অ্যাস্টোভ নামে এক ছোট্ট দ্বীপ থেকে। তাঁরা যে সব ছোট মালজাহাজ ভাড়া করে ভারত থেকে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট বিদেশে পাঠান, তারই দু' একটি ফেরবার পথে অ্যাস্টোভ দ্বীপ হয়ে এই গুয়ানো নিয়ে আসে। শুধু অ্যাস্টোভ দ্বীপের গুয়ানো নয়, এক দিক দিয়ে তার চেয়ে অমূল্য পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এক সাতরাজার

ধনও তারা আনে আরো উত্তরের সেচেলিস্ দ্বীপপুঞ্জের প্রাসলিন বলে একটি ছোট্ট দ্বীপ থেকে।

মামাবাবু আমায় সেই সাতরাজার ধনের প্রলোভনই দেখিয়ে ছিলেন।

মগনলাল ব্রাদার্সের অংশীদার সুন্দরদাস ঠিক কি জন্যে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জানি না। সেদিন আমি বিকেলে যখন মামাবাবুর বাসায় গিয়ে পৌঁচেছি, তখন তিনি বিদায় নিচ্ছেন। তাঁর শেষের আলাপটুকুই শুধু শুনে সামান্য যা বুঝেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন—

তাই বলছি, আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন, সেন সাহেব। সারা দুনিয়ায় এ জিনিস আর কোথাও নেই। দু'শ বছর আগে এ জিনিসের জন্যে রাজারা অর্ধেক রাজত্ব দিতেও পেছপাও হ'ত না। আপনি নিজের চোখে এ জিনিস দেখেও আসুন আর আমাদের সমস্যাটারও মূল কি, তা ধরবার চেষ্টা করুন!

আপনাদের সমস্যা ত আসলে 'মারমেড' নিয়ে।—বলেছিলেন মামাবাবু। অন্য জাহাজের তুলনায় 'মারমেড' অনেক কম ভাড়ায় আপনাদের মাল বয়ে আনে। কিন্তু গত কয়েকবার কিছুতেই সময় মত বোম্বাই করাচিতে পৌঁছোতে পারছে না। তার জন্যে লোকসান কিছু আপনাদের বইতে না হলেও ব্যাপারটার মানে আপনারা বুঝতে চান। এই ত?

হ্যাঁ, বুঝতে চাইছি একদিক দিয়ে 'মারমেড'-এর মালিকের খাতিরেই। মালিক 'ষ্টীম ট্রাষ্ট' বলে ছোট একটা বিলাতী কোম্পানি। কোম্পানি অত্যন্ত ভালো। শুধু যে অনেক অল্প ভাড়ায় আমাদের কাজ করে, তা নয়। পৌঁছোতে দেরী হবার জন্যে যে গুনাগার লাগে, তা নিজেরাই দ্বিরুক্তি না করে নিজেদের পাওনা থেকে কাটতে দেয়। তারা নিজেরাই এ ব্যাপারের খোঁজখবর অবশ্য নিচ্ছে। আমরা তাদের হিতৈষী হিসেবে কিছু করতে চাই। তবে সেটা গোপনে করা উচিত বলেই আপনাকে যেতে বলছি। আপনি যেন ওই পথে বেড়াতে চান। বন্ধু ও অতিথি হিসেবে আপনাকে আমরা সেই সুযোগ দিচ্ছি।

খোঁজ খবরে এ পর্যন্ত ত' বিশেষ কিছুই জানতে পারেন নি।—বলেছেন মামাবাবু—শুধু একবার সেচেলিসের রাজধানী মাহে দ্বীপের ভিক্টোরিয়াতে জাহাজটাকে সরকারী নৌ-পুলিশ খানাতল্লাসীর জন্যে দুদিন আটক রেখেছিল এইটুকু জানেন।

হ্যাঁ, সে খানাতল্লাসীও নেহাৎ অকারণ অন্যায়। বলেছেন সুন্দরদাস, সরকারী দপ্তরের কোন ভুল নির্দেশেই সেটা হয়েছিল বোধহয়। খানাতল্লাসীতে কিছুই পাওয়া যায়নি। যাবেই বা কি? অতি সাধারণ একটা মালের ট্র্যাম্প জাহাজ। ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট আর গুয়ানো বওয়াই তার কাজ। নৌ-পুলিশ ক্ষমা চেয়ে সসম্মানে তাই 'মারমেড'কে ছাড়পত্র দিয়েছে। মারমেড-এ খানাতল্লাসী সেই একটিবারই হয়েছিল, কিন্তু তারপরও জাহাজ কয়েকবার ধরে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারছে না। এ ব্যাপারে রহস্য যদি কিছু থাকে তা আলাদা ধরনের বলেই তাই সন্দেহ হয়।

মারমেডের নাবিকদের মধ্যে একটা কি কুসংস্কারের ধারণার কথা বলছিলেন না?—বলেছেন মামাবাবু।

হ্যাঁ! আজগুবি ধারণা!—হেসে বলেছেন সুন্দরদাস।—মারমেড-এর ওপর কোন এক সমুদ্রের অপদেবতার ভর হয়েছে, এই গুজব তাদের মধ্যে রটেছে। সেই অপদেবতাই নাকি জাহাজকে বিপথে চালিয়ে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। ট্র্যাম্প জাহাজের প্রায় মুখ্খু সুখ্খু নাবিকদের মধ্যে ওরকম কুসংস্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ও সবে আপনাকে কান দিতে বলছি না। আপনি নিজের চোখ কান খোলা রেখে হয়ত কিছু ধরতে পারবেন, এই আমাদের আশা।

সুন্দরদাস তারপর নমস্কার জানিয়ে চলে গেছেন। মামাবাবু বর্মায় যখন ছিলেন, তখন থেকেই মগনলাল ব্রাদার্সের সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সে কথা এবার অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়েছে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর কাছে ও কোম্পানির পরামর্শ চাওয়া চিঠিও দু-একটা মাঝে মাঝে দেখেছি।

সুন্দরদাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু আমাকে একেবারে অবাক

করে দিয়ে বলেছেন—পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, 'কোকো ছ মের' তাহলে আমরা দেখতে যাচ্ছি।

আমরা যাচ্ছি মানে?—আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছি—আর অষ্টম আশ্চর্য কোকো ছ মের, সে-ই বা কি বস্তু?

আমরা যাচ্ছি মানে,—মামাবাবু যেন প্রথম ভাগ পড়াবার গলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন—তুই আর আমি কাল বুধবার বিকেলে বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছি, আর শুক্রবার বোম্বে পৌঁছে সেই দিনই সন্ধ্যায় বি আই এস এনের এক প্যাসেঞ্জার জাহাজে বোম্বে থেকে আফ্রিকার কিনিয়ায় মোম্বাসা বন্দরে পাড়ি দিচ্ছি। মোম্বাসায় দুদিন থাকবার পর আর এক জাহাজে যাচ্ছি দুনিয়ার সব চেয়ে আশ্চর্য রূপকথার সাত রাজার ধন, অতল সাগরের অমৃত ফল কোকো ছ মের স্বচক্ষে দেখতে আর নিজেদের মুখে চাখতে।

আমার হাঁ-করা মুখ দিয়ে আর কথা বার হয়নি।

মামাবাবুই আবার বলেছেন—কোকো ছ মের কি বস্তু বুঝতে পারিস নি ত? না পারবারই কথা। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আগে এ বস্তু যে কি, ও কোথাকার, কেউই জানত না। মধ্যযুগে এ বস্তু অতি বিরল ছিল। কখনো কখনো সিংহল আর ভারতবর্ষের উপকূলে অদ্ভুত এক ফলের মত জিনিস সমুদ্রের ঢেউএ ভেসে আসত। সে ফলের শাঁস অমৃত বলে লোকে বিশ্বাস করত। হেন রোগ নেই যা নাকি তা খেলে সারে না। যে কোন বিষ তা কাটিয়ে দেয়, এই ছিল তখনকার ধারণা। গভীর সমুদ্রের তলায় একটি মাত্র নাকি গাছ আছে, যাতে এই আশ্চর্য ফল ফলে। পৃথিবীর সব সমুদ্রের স্রোত সেই অতলে গিয়ে মিশেছে, সেখানকার ঘূর্ণিতে পড়লে কোন জাহাজ আর ফেরে না। সেই আজব গাছের অবাক ফল কালে-ভদ্রে নাকি খসে পড়ে, সমুদ্রের স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসে গিয়ে দূর কোন উপকূলে পৌঁছে নিজে নিজেই হেঁটে ডাঙায় ওঠে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এ ফল সম্বন্ধে এরকম আজগুবি কিংবদন্তী ছড়ানো খুব অস্বাভাবিক নয়। একটি এই ফলের ওজন আধ মণের ওপর পর্যন্ত হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সেচেলিস দ্বীপপুঞ্জের প্রাস্‌লিন

দ্বীপটি আবিষ্কারের পর এ ফলের রহস্যের মীমাংসা হয়। কোকো দ্য মের মানে সমুদ্রের নারকেল পৃথিবীর এই একটি মাত্র দ্বীপেই জন্মায়। জন্মভূমি জানা গেলেও কোকো দ্য মের এখনও অবাক-করা ফল। এ ফল একশ' ফুট লম্বা গাছে ফলে। তাও গাছের বয়স পঁচিশ বছর হবার আগে নয়। গাছগুলো কতদিন বাঁচে এখনো সঠিক জানা যায়নি। ১৭৬৮ সালে দেখা কয়েকটা গাছ অন্তত এখনো বেঁচে আছে। এ ফল গাছে ঝুলো হতেই লাগে নিদেন পক্ষে সাত বছর। এ ফল দেখবার এমন সুযোগ কি ছাড়ে!

সত্যি সত্যিই তারপর মামাবাবুর সঙ্গে একদিন মোম্বাসায় পাড়ি দিয়েছি।

এখনকার পাসপোর্ট, ভিসা, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, পি ফর্মের দিন হলে অবশ্য সম্ভব হত না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও বছর দশেক আগের কথা। পৃথিবীতে ওসব বেড়া তখনও দুর্লঙ্ঘ্য হয়নি।

মোম্বাসায় দুদিন থেকে 'মারমেড' জাহাজে চলে প্রাসলিন দ্বীপে পৌঁছেছি। মুগ্ধ হয়েছি সেখানকার কোকো দ্য মের বা দানব নারকেলের অরণ্য দেখে। এবার জাহাজ চলেছে অ্যাস্টোভ দ্বীপে গুয়ানো বোঝাই করতে। ইতিমধ্যে ওই আধাভৌতিক রহস্যময় নারী-মূর্তির আবির্ভাবে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে সমস্ত জাহাজে।

পরের দিন সকালেই সে উত্তেজনা অমন তীব্র হয়ে উঠবে, কে জানত!

সমুদ্রের হালচাল বোঝা এখনও বুঝি মানুষের অসাধ্য। ক'দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার পেয়েছি। শান্ত সমুদ্রে মৃদুমন্দ হাওয়ার ঢেউ। হঠাৎ কাল সন্ধ্যা থেকেই গাঢ় কুয়াশায় দিগ্বিদিক ঢেকে গেছে। রাত্রে একটা তারার কণা কোথাও দেখা যায়নি। ওপরের ডেকে উঠে মনে হয়েছে সমুদ্রে নয়, যেন মেঘলোকের ভেতরেই আছি। ডেক থেকে সকাল সকালই নেমে এসে কেবিনে শুয়ে পড়েছি। কেবিনে মামাবাবুকে না দেখে একটু অবশ্য অবাক হয়েছিলাম। রাত্রের ডিনার

শেষ করে বিছানায় গড়াবার জন্যে মুখটা ধোবার পর্যন্ত যাঁর প্রায় তর সয় না, তিনি আজ এই বিদঘুটে কুয়াশার রাত্রে বিছানা ছেড়ে গেলেন কোথায়! মামাবাবুর অবশ্য সব কিছুই অদ্ভুত। কাল বিকেলেই যেমন তাঁর হাতে একটা পুরোন পত্রিকা দেখেছি। পত্রিকাটা আবার পোর্টুগীজ ভাষায় সাপ্তাহিক। আমায় কৌতূহল ভরে সেটা লক্ষ্য করতে দেখে বলেছেন, পোর্টুগীজ শেখবার চেষ্টা করছি রে। সে পত্রিকা নিয়ে যেমন, তাঁর রাত্রে ঘরে না থাকা নিয়েও বেশীক্ষণ অবশ্য মাথা ঘামাই নি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে জেগেছি একেবারে ভোর বেলায়।

ঘুম ভাঙবার পরই একটা কি রকম অস্পষ্ট অস্বস্তি টের পেয়েছি। কি যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটার আভাস। দু-এক মিনিট বাদে এ অস্বস্তির কারণটা যেন অনুমান করতে পেরেছি। জাহাজটা চলছে না। থেমে থাকার এই স্তব্ধতাটাই নিজের অজান্তে অস্বস্তি জাগিয়েছে। কিন্তু জাহাজ এখন থেমেছে কেন? অ্যাস্টোভ দ্বীপে এত তাড়াতাড়ি পোঁছোনোর কথা নয়। সেকেণ্ড মেটের সঙ্গে আলোচনায় জেনেছি, আজ বিকেলের আগে সেখানে পোঁছোন হবে না। তাহলে জাহাজ কোথায় কি কারণে থামলে? মামাবাবুই বা এই সাত সকালে গেলেন কোথায়? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরে বাইরে গিয়ে যা শুনেছি, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। রাত্রের কুয়াশার মধ্যে দিক ভুল করে বিপথে গিয়ে জাহাজ সম্পূর্ণ অন্য একটি দ্বীপে এসে পোঁছেছে। সেকেণ্ড মেটই ছিলেন জাহাজ চালাবার কাজে। কুয়াশার মধ্যে যথানিয়ম কম্পাসের নির্দেশেই তিনি জাহাজ চালিয়েছেন। কিন্তু ভোরে কুয়াশা কেটে যাবার পর অবাক হয়ে দেখেছেন কম্পাসের কাঁটাই তাঁকে ভুল পথে চালিয়ে অ্যাস্‌টোভের বদলে অ্যালডাব্‌রা নামে অন্য একটি দ্বীপে নিয়ে এসেছে। প্রথমটা হতভম্ব হলেও সেকেণ্ড মেট অগডেন রাগে তার পর ফেটে পড়েছেন।

অগডেনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বার হবে। উত্তেজিত ভাবে ক্যাপ্টেনকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে, এ ব্যাপারে জাহাজের কোনো বদমায়েসের কারসাজি নিশ্চয় আছে। কম্পাসের কাছে কেউ লুকিয়ে

কোন চুম্বক বা লোহার কিছু অন্তত লুকিয়ে রেখেছে। নইলে কম্পাসের এ ভুল হওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেনকে তাই তিনি জাহাজের সবাইকে ডাকিয়ে জেরা করতে অনুরোধ করছেন।

ক্যাপ্টেন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে ধৈর্য ধরে সব শুনে বললেন—কিন্তু চুম্বক বা লোহার কিছু লুকিয়ে যে কেউ রেখেছে, তার প্রমাণ কি? আমি ত আপনার সঙ্গেই সব খুঁজে দেখলাম। কোথাও সেরকম কিছু ত নেই।

সেকেণ্ড মেটকে এবার অনিচ্ছার সঙ্গে সে কথা স্বীকার করতে হল।

আমি এসে সেকেণ্ড মেটের সেই রুদ্র মূর্তিই দেখলাম। সেখানে তখন ক্যাপ্টেন ডিগ্‌বি আর মামাবাবুর ছাড়া কেউ নেই। মামাবাবু এই ভোরে যে এখানে হাজির থাকবেন ভাবতেই পারিনি।

তাহলে?—ক্যাপটেন ডিগ্‌বি নিজেই বেশ ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। বললেন—ও ধরনের কিছু থাকলে ত কম্পাসের কাছা-কাছি থাকবে! কম্পাসের এ রকম বিগড়ে যাওয়ার মানেই ত বোঝা যাচ্ছে না।

মানেটা যদি ভৌতিক হয়?

মামাবাবুর কথায় সবাই আমরা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

ভৌতিক!—সেকেণ্ড মেট বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ,—মামাবাবুর গলায় কৌতুকের একটু যেন আভাস!—এ জাহাজের সেরকম একটা দুর্নাম ত শুনেছি। জাহাজের ওপর কোন এক অপদেবতার নাকি কুদৃষ্টি আছে। সে-ই জাহাজকে ভুল রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যায় বলে গুজব।

এ হাসি-তামাসার সময় নয়, মিঃ সেন।—ক্যাপটেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন।

ব্যাপারটা তাহলে গুরুতর কিছু বলছেন!—মামাবাবুর গলা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর শোনালো—বেশ, কম্পাসের ভুলে জাহাজ তাহলে কোথায় এসে থেমেছে জিজ্ঞাসা করতে পারি?

এটা অ্যালডাবরা দ্বীপ।—বললেন ক্যাপটেন,—যেখানে আমাদের যাবার কথা সেই অ্যাস্টোভ দ্বীপের উত্তর পশ্চিমে।

হুঁ, আগেই জানতাম। টেস্‌টুডো এলিফ্যান্টিনা-র দেশ।—মামাবাবু আমাদের সকলকেই বোধ হয় থ' করে দিলেন।

কিসের দেশ বললেন?—ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন ভ্রূকুটিভরে।

টেস্‌টুডো এলিফ্যান্টিনা—মামাবাবু শান্ত গলায় বললেন—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাতমণি কচ্ছপ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানেই জাহাজ থামবে আপনি আগে জানলেন কি করে? —জিজ্ঞাসা করলেন সেকেণ্ড মেট।

জেনেছি এর আগেও বার কয়েক পথ ভুলে জাহাজ এখানেই থেমেছে বলে।—মামাবাবু ক্যাপটেনের দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসুভাবে, —কেমন তাই না?

কোথায় থেমেছে না থেমেছে আপনি জানলেন কি করে?—ক্যাপটেন এবার বেশ গরম।

জেনেছি, আপনাদের লগ্‌বুক দেখে!—মামাবাবুর মুখে গা-জ্বালানো হাসি।

লগ্‌বুক দেখে! লুকিয়ে আমাদের লগবুক দেখছেন আপনি! —ক্যাপটেন জ্বলে উঠলেন।

লুকিয়েই দেখেছি সত্যি। কিন্তু প্রকাশ্যে দেখবার অধিকারও আমার আছে।—মামাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ক্যাপটেনের সামনে খুলে ধরে বললেন—এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন ষ্টিম ট্রাষ্ট আর মগনলাল ব্রাদার্স দু' তরফ থেকেই আমায় ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে 'মারমেড' জাহাজের ব্যাপারে যা আমার দরকার মনে হয় সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখবার।

আপনি! আপনি তাহলে আমাদের মধ্যে গুপ্তচর হয়ে এসেছেন! —ক্যাপটেন ঘৃণার সঙ্গে বললেন।

হ্যাঁ, সেরকম গালাগালও দিতে পারেন।—মামাবাবু নির্বিকার ভাবে বললেন—তবে শুধু আমাকে নয়, আপনার ফার্স্ট মেট এই মিঃ ষ্টিলকেও।

ফার্স্টমেট মিঃ ষ্টিল কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, লক্ষ্য করিনি। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

মামাবাবু তখন বলে যাচ্ছেন—মিঃ ষ্টিলকেও জাহাজের রহস্য সন্ধানের জন্যেই বৃটেনের নৌ পুলিশ বিভাগ থেকে ফার্স্টমেট সাজিয়ে পাঠান হয়েছে।

ক্যাপটেন একবার মামাবাবু আর একবার মিঃ ষ্টিলের দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে এবার কেমন একটু যেন থতমত খেয়ে অসহায় ভাবে বললেন,—আমার ওপর তাহলে ষ্টিম ট্রাষ্টের বিশ্বাস নেই বুঝতে হবে। কিন্তু আমি কি নিজেই এ রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করছি না? ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছে থাকলে লগবুকের বিবরণ কি বদলে লেখাতে পারতাম না? এখনি সব জানাজানি হলে এ জাহাজের অফিসার থেকে সাধারণ নাবিকের মধ্যে নিরীহ নির্দোষ অনেকের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে বলেই আমি নিঃশব্দে রহস্যটার মীমাংসা করতে চেয়েছি।

কিন্তু ওই মায়াদয়া করতে গিয়েই রহস্যের খেই আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, মিঃ ডিগ্‌বি।—বললেন ফার্স্টমেট-রূপী মিঃ ষ্টিল।

হ্যাঁ, বারবার জাহাজ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই কেন পথ ভুলে এসে থামে তা অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টা করতেন।—মামাবাবুও যোগ দিলেন।

তা বোঝবার চেষ্টা করিনি মনে করছেন!—ক্যাপটেন বেশ ক্ষুণ্ণ —কাল রাত্রে আমি নিজে কতবার এসে মিঃ অগডেনের সঙ্গে কম্পাস তদারক করে গেছি জানেন? কম্পাস এরকম ভাবে বিকল হবার কোন কারণই ত' খুঁজে পাচ্ছি না।

কারণ ত' মিঃ অগডেনই আগে বলে দিয়েছেন।—মামাবাবু হাসলেন, —কম্পাসের কাছে কোন চুম্বক জাতীয় জিনিস থাকাই হল আসল কারণ।

কিন্তু মিঃ অগডেনের সঙ্গে আমি নিজে ভালো করে এ কামরা খুঁজে দেখেছি।—ক্যাপটেন এবার উত্তেজিতভাবে বললেন—ম্যাগনেট জাতীয় কোন কিছুই পাইনি। আপনারাও খুঁজে দেখুন না।

তা ত দেখতেই হবে।—মামাবাবুর গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত।

সেকেণ্ড মেট অগডেন নীরবে অপ্রসন্ন মুখে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বিরক্তির সঙ্গে বললেন—আমি তাহলে এখন যাচ্ছি। সারারাত জেগে কাটিয়েছি, এখন বিশ্রাম দরকার।

মিঃ অগডেন পা বাড়াতেই কিন্তু মামাবাবু বাধা দিলেন।

দাঁড়ান, যাবেন না, মিঃ অগডেন। আর যদি যেতে চান ত আপনার ওভারকোটটা খুলে রেখে যান।

ওভারকোট খুলে রেখে যাব!—অগডেন গরম মেজাজে ফিরে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ, ওই ওভারকোটেই এ জাহাজের রহস্যের চাবিকাঠি আছে কি না।

মামাবাবু ও মিঃ ষ্টিল দুজনেই তখন দুদিক থেকে অগডেনকে গিয়ে ধরেছেন।

আমি ও ক্যাপটেন হতভম্ব হয়ে তাঁদের দিকে তাকাতে মামাবাবু হেসে আবার বললেন—খুব অবাক হচ্ছেন, মিঃ ডিগ্‌বি? কিন্তু ওভারকোটের এই বোতামগুলো দেখেছেন। একটু বেখাপ্পা গোছের গড়ন নয়?

বলতে বলতে ওভারকোট থেকে সজোরে একটা বোতাম ছিড়ে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন—এই বোতামের ভেতরেই লুকোন ম্যাগনেট। ওই দিয়েই জাহাজের কম্পাস নিজের দরকার মত বেঠিক করে অপদেবতার কোপের গুজব তৈরীর চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু বোতামের মধ্যে লুকোন ম্যাগনেটের কথা আমার মাথায় আসেনি, মিঃ সেন।—শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের স্বরে বললেন মিঃ ষ্টীল,—আপনি বুঝলেন কি করে?

বুঝলাম কাল রাত্রে প্রথম মিঃ অগডেনকে এই ওভারকোট পরে কনট্রোলে আসতে দেখে। এখন বেশ গরমের দিন যাচ্ছে। ওভার-কোট চাপাবার কোন প্রয়োজনই হয় না। কাউকে না বুঝতে দিয়ে কম্পাস বিকল করবার একমাত্র উপায় হল ম্যাগনেট জাতীয় কিছু। সে ম্যাগনেট সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কিভাবে রাখা সম্ভব, ভাবতে গিয়েই

ওভারকোটের বোতামের কথা আমার মাথায় আসে। আচ্ছা, মিঃ অগডেনকে এখন নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখুন, মিঃ ষ্টীল। আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কাজের কথাগুলো সেরেই যাচ্ছি। আশা করি মিঃ অগডেন গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না।

না, তা করব না।—ধরা পড়েও ভেঙে না পড়ে অবজ্ঞা ভরে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে অগডেন,—আমায় বন্দী করে আপনারাই বা করবেন কি? বিলেতে বিচার হয়ে বড় জোর আমার চাকরিটা যাবে। তার চেয়ে বেশী কিছু যদি হয় তাহলে কিছু দিনের জেল। আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু এ জাহাজের রহস্য তাতেই সব বুঝে ফেলবেন মনে করেছেন?

নেহাৎ চাপা রাগে ও আক্রোশেই বোধ হয় অগডেনের মুখ আলগা হয়ে শেষ আস্ফালনটা বেরিয়ে পড়েছিল। মামাবাবু তার উত্তর না দিয়ে একটু শুধু হাসলেন।

মিঃ ষ্টিল অগডেনকে নিয়ে চলে যাবার পর ক্যাপটেনই আবার সে কথা তুলে তাঁর সংশয় ও উদ্বেগটা প্রকাশ করে ফেললেন।

অগডেন ত সত্যি কথাই বলে গেল, মিঃ সেন। ম্যাগনেটের সাহায্যে কম্পাস বিগড়ে দিয়ে জাহাজ ভুল পথে চালাবার জন্য অগডেনের হয়ত ভালো রকম সাজাই হবে। কিন্তু 'মারমেড'-এর রহস্য তাতেই ত সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না!

রহস্য সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে, মিঃ ডিগ্‌বি।—মামাবাবু আশ্বাস দিলেন—জাহাজে ভৌতিক মহিলা আমদানি করে আমাদের আসল রহস্য থেকে নজর সরিয়ে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের সব ফন্দি ফিকিরই ধরে ফেলেছি। আপনি এখন অ্যাস্টোভ-এর বদলে মাদাগাস্কারের উত্তর পশ্চিমের 'নোজি বে' বন্দরে জাহাজ চালাবার হুকুম দিন দেখি।

'নোজি বে' বন্দরে!—ক্যাপটেনের মুখ একটু গম্ভীর হল—তা ত আমি পারি না, মিঃ সেন। কোম্পানির যে নির্দেশ নিয়ে আমি মোম্বাসা থেকে জাহাজ ছেড়েছি তা লঙ্ঘন করতে আমি পারি না।

লঙ্ঘন ত এর মধ্যেই করেছেন!—মামাবাবু হাসলেন—তবে তা অবশ্য নিজের অজান্তে ও অনিচ্ছায়। যাই হোক, কোম্পানির নির্দেশ অমান্য করতে আপনাকে হবে না। ষ্টীম ট্রাষ্টের লণ্ডন অফিস থেকে এতক্ষণে 'নোজি বে'-তে জাহাজ নিয়ে যাবার নির্দেশ এসে গেছে বলেই মনে করি। আপনি 'স্পার্কস' অর্থাৎ ওয়্যারলেস অফিসারের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন। জাহাজ কিন্তু এখুনি ছাড়তে হবে, মিঃ ডিগবি।

নির্দেশ এসে থাকলেও এখুনি কি করে জাহাজ ছাড়ব, মিঃ সেন? —ক্যাপটেন এবার একটু বিব্রত ভাবে জানালেন—জাহাজ এখানে থামবার পর আমাদের তুজন নাবিক যে বড় কচ্ছপ দেখবার জন্যে একটা বোট নিয়ে দ্বীপে গেছে। তুজনেই বলতে গেলে ছেলেমানুষ। তাই আমি অনুমতি না দিয়ে পারিনি।

তাদের একজন বিল মার্ফি, কেমন?—জিজ্ঞাসা করেছেন মামাবাবু।

হ্যাঁ, বিল মার্ফি আর ডিক রবার্টস বলে একজন ও. এস.।—বললেন ক্যাপটেন—তারা ঘণ্টা তুয়েক বাদেই ফিরবে।

তাদের ফিরতে দেওয়া আর হবে না মিঃ ডিগবি।—মামাবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন,—ওই দ্বীপেই হাতে হাতে যাতে তারা ধরা পড়ে, তার ব্যবস্থাই করতে হবে এখন। ধরা অবশ্য শুধু বিল মার্ফিই পড়বে। ডিক রবার্টস না জেনে তার সঙ্গী হয়েছে মাত্র। সুতরাং প্রথমে ধরলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এসব আপনি কি বলছেন, মিঃ সেন!—ক্যাপটেন একটু বিরক্ত ও সন্দিগ্ধ ভাবেই মামাবাবুর দিকে তাকালেন। মনে হল মামাবাবু আবোল-তাবোল বকছেন বলেই তাঁর ধারণা।

আজগুবি কিছু বলছি না, মিঃ ডিগবি! বিল মার্ফি হাতে হাতে কি ভাবে ধরা পড়বে জানেন? ধরা পড়বে ওই দ্বীপের টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা মানে হাতী-কচ্ছপের পিঠের খোলার পেছনের খাঁজে চোরাই হীরে সিমেন্ট পুডিং দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টায়। আফ্রিকা থেকে চোরাই হীরের কারবারীরা এই অদ্ভুত ফিকির কিছুকাল ধরে

চালাচ্ছে। এই ফিকির এমন যে, কারুর সন্দেহ হবার কোন উপায়ই নেই। চোরাই হীরে যারা পাচার করে, তারা আপনাদের মারমেড-এর মত কোন কোন জাহাজের দু-চার জন অফিসারকে টাকা দিয়ে হাত করে নানা ছলে এ দ্বীপে জাহাজ লাগাবার ব্যবস্থা করে। তারপর ওই হাত-করা দলের কেউ অতিকায় কচ্ছপ দেখার ছুতোয় দ্বীপে গিয়ে কচ্ছপদের গায়ে হীরে আটকে দিয়ে আসে। অতিকায় কচ্ছপ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। দ্বীপের একটি অংশেই তাদের পাওয়া যায়। সুতরাং কাজটায় খুব অসুবিধে নেই। এরপর আসল ব্যাপারীদের দলের আর কেউ এক সময়ে অন্য জাহাজে বা স্লুপে এসে সেখানে এ সব হীরে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এ সব দ্বীপে সখের টহলদারের অভাব নেই। তারা আসে ঘুরে ফিরে চলে যায়। তাদের কেউ যে চোরাই হীরে সংগ্রহ করতে আসে, এ সন্দেহ কে করবে? অ্যালডাবরা দ্বীপে কচ্ছপের গায়ে চোরাই হীরে থাকার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। নানা দেশের পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও চোরাই হীরে চালানের এই একটা অদ্ভুত ঘাঁটির কথা তাই এতদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মারমেড-এর বিপথে ঘোরার রহস্য ভেদের চেষ্টায় আসবার সময় মাহে দ্বীপে একবার 'মারমেড' খানাতল্লাসী করা হয় জেনেই আমার মনে সন্দেহ জাগে। মোম্বাসায় খোঁজ নিয়ে চোরাই হীরের ব্যাপারেই এ খানাতল্লাসী হয় জেনে সন্দেহটা দৃঢ় হয়। মারমেড তল্লাস করে তখন কিছু পাওয়া যায়নি। যাবে কি করে? অ্যাল্‌ডাব্‌রায় চোরাই হীরে তার আগেই চালান হয়ে গেছে। অ্যালডাব্‌রা দ্বীপেই কয়েকবার মারমেড পথ ভুলে এসে পড়েছে জেনে হীরে চালানের পদ্ধতিটা আমি অনুমান করবার চেষ্টা করি। ভূতুড়ে মহিলার খোঁজে সাধারণ ও, এস্, নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ নিয়ে আমি জানতে পারি যে, জাহাজ এখানে থামলে প্রতিবারই বিল মার্ফি কখনো একলা কখনো আর কারুর সঙ্গে কচ্ছপ দেখবার ছুতোয় এ দ্বীপে নেমেছে। কচ্ছপ যেখানে পাওয়া যায় সে জায়গার বাইরেও কোথাও সে যায়নি।

কচ্ছপদের সাহায্যেই যে চোরাই হীরে লুকোন হচ্ছে এ বিষয়ে

তখনই আমি নিঃসন্দেহ হই। আমার প্রমাণ যে ঠিক মিঃ ষ্টীলই তার প্রমাণ আমায় দেখান। নৌপুলিশ বিভাগ থেকে কাউকে যে এ বিভাগে পাঠান হয়েছে তা আমি জানতাম। ষ্টীল-ই যে সেই লোক তাই শুধু আগে বুঝতে পারিনি।

'বেরে' পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি যে উনি মাত্র এক মাস এ জাহাজে যোগ দিয়েছেন। তাইতেই ওঁকে আসল লোক বলে অনুমান করে পরে গোপনে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করি আর দুই কোম্পানি থেকে আমায় যা চিঠি দিয়েছে তা ওঁকে দেখাই।

উনিও তখন 'বোলেটিন দা মোজাম্বিক' অর্থাৎ মোজাম্বিক থেকে বারকরা একটা সাপ্তাহিক ইস্তাহার গোছের কাগজের পুরানো একটা সংখ্যা আমায় দেখান।

অতি সাধারণ কাগজ। তাও পোর্তুগীজ-এ লেখা বলে সে সংখ্যার একটা ছোট ভ্রমণ-কাহিনী মোজাম্বিকের বাইরে কারুর নজরে পড়েনি।

মিঃ ষ্টীল সে ভ্রমণ-বিবরণের একটা জায়গা আমায় অনুবাদ করে শোনান। একজন পোর্তুগীজ তাতে লিখেছেন যে ম্যাডাগাস্কারের উত্তরের ছোট ছোট সব দ্বীপে একটি স্লুপ নিয়ে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে অ্যালডাবরা দ্বীপের বিরাট দানব কচ্ছপও তিনি দেখে এসেছেন। একটি কচ্ছপের মাপজোক নিতে গিয়ে তিনি তার পেছনে ছোট আধময়লা কাঁচের টুকরোর মত একটি পাথর আঁটা আছে দেখেন। পাথরটা খুলে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবার পর সেটা সাধারণ পাথর নয় বলেই তাঁর সন্দেহ হয়। সেটা তাই তিনি সরকারী রত্নসংগ্রহ বিভাগে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছেন।

ভ্রমণ-বিবরণে সে পরীক্ষার ফলাফল জানানো নেই। মিঃ ষ্টীলের হাতে দৈবাৎ এ কাগজটি পড়বার পর মোজাম্বিক বুলেটিনের সম্পাদকের কাছেই বিশদভাবে বৃত্তান্তটা জানবার জন্যে একবার চিঠি লেখবার ইচ্ছে তাঁর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তিনি লেখেন নি। লেখেন নি এই ভেবে যে তাঁর চিঠি নিয়ে মোজাম্বিক বুলেটিনের দপ্তরে স্বাভাবিক ভাবে একটু সাড়া পড়বেই। তাতে এ ব্যাপারের দুষমনরা

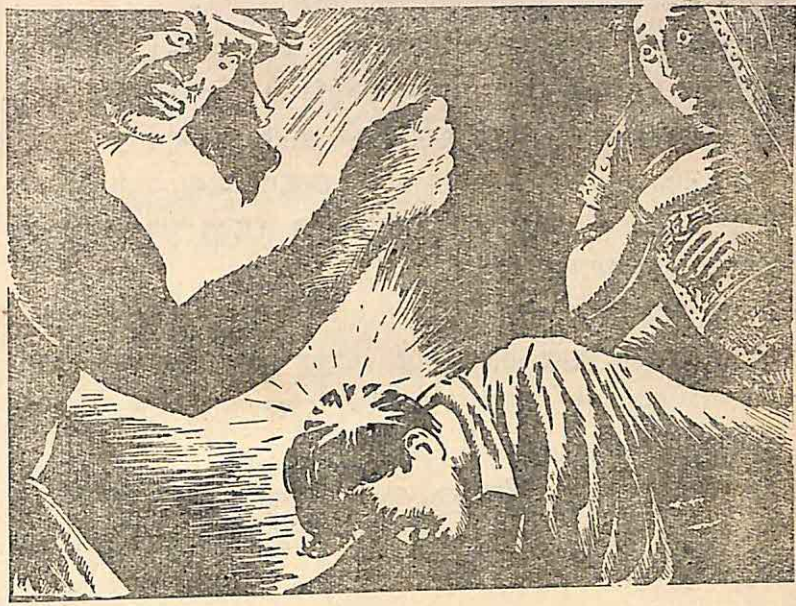
সজাগ হয়ে যেতে পারে। হীরের চোরাই কারবারে তাদের গুপ্ত কৌশল যে ধরে ফেলেছেন এ বিষয়ে ষ্টীলের মনে তখন আর সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে দুষমনদের ধরবার ব্যবস্থাই তাই এখন করা হয়েছে। মার্ফি এই দলের একজন। তাকে ধরতে পারলেই সমস্ত দলের অন্ধি-সন্ধি আর লুকোন থাকবে না বুঝে দানব কচ্ছপের দ্বীপে গোপন পাহারা রাখা হয়েছে তাকে হাতে-নাতে ধরবার জন্যে।

একটু থেমে মামাবাবু আবার বললেন—এখন অ্যালডাবরার রেসিডেণ্ট গভর্নরের কাছে আপনাকে শুধু বেতারে একটু খবর পাঠাতে হবে।

তা পাঠাচ্ছি। —মামাবাবুর দীর্ঘ বিবরণে যেন ঘোর লাগা অবস্থায় ক্যাপটেন বললেন,—কিন্তু জাহাজের সব রহস্যের মীমাংসা এতেই হ'ল কি?

হ্যাঁ,—আমিও মিঃ ডিগ্‌বিকে সমর্থন করে বললাম, আসল রহস্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যেই জাহাজে ভুতুড়ে মেয়ের আমদানি করা হয়েছে বুঝলাম। কিন্তু সে মেয়েটি তাহলে গেল কোথায়?

গেছে ওই অ্যালডাবরা দ্বীপেই। —মামাবাবু হাসলেন,—ওই বিল মার্ফিই মেয়ে সেজে আমাদের মাথা গুলোবার চেষ্টা করেছে। রোগা পাতলা চেহারায় মেয়ে সাজতে ওর কোনো অসুবিধেই হয় নি। 'বেরে'টা খুঁজে পাওয়ায় ভাল করে বেশী চালাকি করতে যাওয়াই অবশ্য ওর মারাত্মক ভুল। স্টীল ও আমি তাইতেই ওর বিষয়ে সন্দিগ্ধ হই।



ধলেশ্বরীর বুকে

অনেকদিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোনো নদীর স্রোতে পানসি ভাসিয়ে কয়েকটা দিন-রাত্রি খেয়াল মতো কাটিয়ে দেবো। অনেকদিন থেকে—মানে 'ছিন্নপত্রে' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিলো, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতে অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনো হাঁসের পাখার শব্দ, সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায়নি, সে সব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোনো জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনো। সে যেন কোনো রূপকথার ভূগোলের নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' তো রেলি ব্রাদার্সের পাটের ষ্টীমার যায় না, সে পদ্মা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর একটি—রুপো-গলানো তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্য যেতে।

ছেলেবেলার সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেলো। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেলো তা বলতে পারি না। কারণ, নদীটা পদ্মা নয় ধলেশ্বরী। কিন্তু তাতে এমন কিছুই আসে যায়-না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হলো, ফুলে উঠলেই হলো হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হলো তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হতো। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগতো কাটাকাটি মারামারি, আমার স্বপ্ন যেতো ভেঙে আর স্মৃতিও জমতো না মধুর করে।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের! সেও ছোটোখাটো রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তারো বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চকাচখির ডাকে তারো দু'কূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পানসি ভাড়া করেছিলাম। মাঝি-মাল্লা চাকর-বাকর নিয়ে সবসুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এতো লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে সুস্থে যেমন খুশি ভেসে যাওয়াই ছিলো আমাদের কাজ। তাও বড়ো বড়ো গঞ্জে কি লোকালয়ের ভীড়-করা ঘাটে নয়, শূন্য নির্জন তীরে তীরে, শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরন মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবাইএর ছুটি, একা চরনই বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হলো, তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত নিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রের' স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পানসির জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারতো! গরমিল তো কম নয়! ছিন্নপত্রের পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরন মাঝির চেহারায় পর্যন্ত খুঁত

ধরবার অনেক কিছু ছিলো। কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এই জন্যে বলছি যে, চরন মাঝির চেহারাটায় সব সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন-মাঝ-রাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির খোলে, মেঘ-ঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, আর মিশরের মমির মতো শুধু চরন আছে বসে নিস্পন্দভাবে হালে, কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে, আমি আগে কখনও জানতাম না। রং তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিরই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কি একটা অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়ে ছিলো। এই সবে উঠে এসেছে, শ্যাওলাধরা ভিজে মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-ধারনও অদ্ভুত। কথা সে খুব কম কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু আধটু 'হাঁ' 'না' ছাড়া তাকে আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলামেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে তার মরা চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও আকাশ মেঘে-ঢাকা, ভাঙা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছম্ ছম্ করছে।

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস্-ফিস্ গুন-গুন শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেলো।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান মাথা চুলকে, আমতা আমতা করে জানালো যে, আমি যদি তাদের এক রাত ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

'যাত্রা' কোথায় হচ্ছে হেসে জিগ্যেস করে জানলাম, খানিক আগে

যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেখানেই নাকি ভারী নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শোনবার ভাগ্য নাকি এ তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে, সে আমাকেই সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম—না, না মাঝির পো, আমার অতো শখ নেই। তবে তোমরা শুনে আসতে পারো, ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারবো না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালো যে, আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতোটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলা, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে, মন্দ কি!

মাঝি সাহস দিয়ে জানোলো যে, এখানে ভয়ের অবশ্য কিছু নেই। জল ঝড়ের সময় নয়, তাছাড়া নৌকো নোঙর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিগ্যেস করলাম জানি না—চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?

মাঝির মুখে, 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে যেন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একবার পানসির কামরার ছাদে উঠে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রামসেবক পর্যন্ত গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও দু-একটা নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—ভাবতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতা ধ্যান করতে করতে কখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের অন্ধকার দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে, কিন্তু ভাঙা

চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারী অস্বস্তিকর লাগলো। একটা নাম-না-জানা পাখি দূর আকাশে কি রকম আর্তনাদের মতো ডাক ছেড়ে উড়ে গেলো। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোনো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতোবড়ো একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিলো নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটলধরা বিশাল দেয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতোক্ষণ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এ বাড়ি কুয়াশায় মিশে ছিলো, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারে দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এ পোড়ো প্রাসাদ সম্বন্ধে কালকে মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হলো।

পেছনে কি একটা ঝনঝন্ করে শব্দ হলো যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটা লোককে অপ্রত্যাশিত ভাবে আবিষ্কার করলে, গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধহয় নয়।

একি চরণ! প্রায় ধরা গলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে? যাত্রা দেখলে না!

সে শেকল সমেত নোঙরটা তুলে পানসির ওপর রেখে, গম্ভীর স্বরে বললে—না।

কিন্তু নোঙর তুললে কেন? অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিগ্যেস করলাম আমি।

তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভাল লাগছিলো না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছেন ?

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রিশেষে অদ্ভুত অসাধারণ সব ঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছে আমার জীবনে, তখনো তেমন ভালো করে বোধহয় বুঝি নি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও, জানো নাকি ?—চীৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে। হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভেড়াতে ভেড়াতে চরণ নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত ব্যাকুল স্বরে বললেন—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই!

সে অবস্থায় যতোদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতোদূর সাধ্য চেষ্টা করবো, কিন্তু কি ব্যাপার আমার আগে একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরার চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে, ভদ্রতা করে বললাম—ওটা বড্ড ভারী বোধ হয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ কথায় এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয় ও কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ় ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল করে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটু অদ্ভুত আকারের একটা বাক্স বার করে, আমার সামনে রেখে তিনি বললেন—আমায় মাপ করবেন, অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমন হয়ে গেছি।

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এইবার ভালো করে দেখলাম। চেহারায় তাঁর স্পষ্ট বড়ো ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরণ-ধারণ

যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনি তাঁর পোশাক। যাই হোক, তখন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথার উত্তরে জিগ্যেস করলাম —ভয়টা কিসের? কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ডালাটা একবার তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাক্সের ভেতব কুণ্ডুলি পাকানো একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠলো। চমকে গেলাম। সাপ নয় —হীরে মুক্তোর জড়োয়া গয়না! তেমন গয়না আমি তো জন্মে কখনো দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো করে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রূর সরীস্প!

দরজায় খুট্ করে শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক।

পলক না ফেলতেই সে সরে গেলো। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম—তুলে ফেলুন এ সব বাক্সে। এ সব সাঙ্ঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাত্রে একা বেরিয়েছেন?

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলো বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন—বেরুবো না? ওরা যে সব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা?

আমার শ্বশুরবাড়ীর জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতেও পারে! কিন্তু আমি দেবো না, কিছুতেই দেবো না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাবো বাপের বাড়ী। ওরা আমায় দিন-রাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু'-ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেবার জন্য বেরুলাম।

কিন্তু আশ্চর্য। চরণ যেন আগে থাকতেই জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকো চলছে।

বললাম—ক্রোশ দুয়েক বাদে নৌকো থামিয়ে খবর দিও।

নিশ্চলভাবে বসে সে যেন কি একটা অস্পষ্ট জবাব দিলো। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার কামরায় ঢুকে বললাম—আমি বাইরে যাচ্ছি। আপনি এ কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন এখন।

তিনি ব্যকুলভাবে বললেন—না, না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ কি ! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেলো কেন! চরন মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে।

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে যাওয়া চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চীৎকার করে বাক্সটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপরে। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কি রকম একটা আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও, আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে দৈত্যের সঙ্গে পারবেন কি করে!

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা করে নিয়ে, চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি চলেছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্সশুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার দুষমনও।

এতোক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চীৎকার করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য গহনায় বোঝাই ভারী সেই বাক্সের টানে দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারবো না। আমি চীৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। ক'টা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিলো। চীৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়লো। ব্যাকুলভাবে এক নিঃশ্বাসে তাদের যথাসম্ভব ঘটনাটা জানিয়ে যেখানে তারা দু'জন ডুবেছে সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠলো। হেসে জানালো যে, এরকম আজগুবি ব্যাপার হতে পারে না। যতো ভারী জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে, দু'জন না হোক, একজন ভেসে উঠতোই। আর তাছাড়া দু'ক্রোশ কেন, এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোনো পোড়োবাড়ী নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্সসমেত ওরকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে?

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি!

বৃদ্ধ গোছের এক মাঝি একটি ডিঙির এক কোণে বসে এতোক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিলো। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে বললো—না বাবু, আপনি

মিথ্যে বলেননি, আমি জানি। আপনি জঙ্গল-বাড়ির বৌ-রানীকে দেখেছেন।

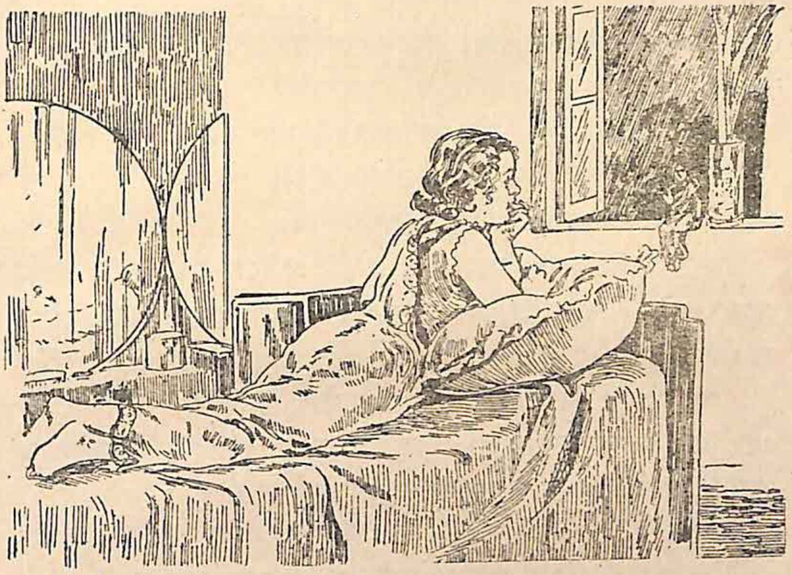
তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে আমি বললাম—জঙ্গল-বাড়ির বৌ-রানী! তুমি জানো তাহলে! কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বলো'ত?

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললো—'ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হলো জঙ্গল-বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌ-রানী তাঁর জ্বালা ভোলেননি! এখনো মাঝে মাঝে কারো পানসিতে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝি-মাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ-মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিলো সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম সব না হয় স্বপ্ন! কিন্তু আমার পানসির নোঙর কে তুললো!

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার পানসি-বিহারে। আমি ছিন্নপত্রই পড়বো।



ঘুমন্ত পুরীর কন্যা

মিনুর মামামণি আজ সন্ধ্যা বেলা কোথা থেকে অনেকগুলো কেয়া ফুল কিনে এনেছেন। বায়না করে তার ভেতর থেকে একটা মিনু চেয়ে নিয়ে তার ঘরে এনে রেখেছে।

কাঁটা দেওয়া লম্বা লম্বা পাতার আড়ালে নরম শাদা ফুলটি যেন লাজুক একটি সুন্দরী মেয়ে। আর কি মিষ্টি তার গন্ধ! সমস্ত ঘর যেন ঢুলে পড়েছে নেশায়।

বাইরে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের বাতি নেভানো। একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিনুর কি ভালোই লাগছে। কেয়াফুলের গন্ধ নয়, যেন ভারি মিষ্টি কার আদর। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়।

কেয়াফুলটা পাশের টেবিলের ওপর ফুলদানিতে মিনু রেখেছে। ঘরের ভিতর বাতি নেভানো, কিন্তু জানালা দরজা দিয়ে একটু আধটু আলো চুইয়ে যে না এসেছে তা নয়। অস্পষ্ট ভাবে ফুলদানিটা

দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ফুলটি যেন শাদার একটা আবছা ছোপ অন্ধকারে।

বাইরের রিম ঝিম বৃষ্টির আওয়াজে, আর ঘরের ভিতর মিষ্টি কেয়ার গন্ধে মিনুর চোখ ঘুমে ক্রমশ জড়িয়ে আসছিল; হঠাৎ ঠুক্ করে একটা আওয়াজে তার ঘোর কেটে গেল।

মিনু একটু অবাক হয়ে উঠে বসল; বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হচ্ছে একটু। দমকা হাওয়ায় জানালার একটা পাল্লা গেছে খুলে। হয়ত তারই শব্দ।

মিনু আবার চোখ বুজতে যাবে, হঠাৎ টেবিলের পাশে স্পষ্ট করে মিষ্টি গলা শোনা গেল। তাইত? ভারী আশ্চর্য! কেয়াফুলটির ভেতর থেকেই যেন কার কথা শোনা যাচ্ছে।

"শুনছ?"

মিনু প্রথমটা বিশ্বাস করতেই চাইল না। কেয়াফুল আবার কথা কয় নাকি! কিন্তু আবার যখন মিঠে গলার মিনতি শোনা গেল—"শুনছ?" তখন সে বলে ফেললে আপনা থেকেই—"কি?"

"আমায় একটু জানালার ধারে রাখবে?"

"কেন বলত?" মিনু জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

"এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না!"

"দেখতে পাচ্ছ না! জানালার ধারে কি দেখবে?"

"বিদ্যুৎকুমারকে!"

মিনু একটু অবাক হল বই কি? বিদ্যুৎই ত সে জানে, বিদ্যুৎকুমার আবার কি? কে জানে হয়ত ভুলই শুনেছে কিম্বা কেয়াফুলেরা হয়ত বিদ্যুতের ওই রকমই বানান করে! কিন্তু কেয়াফুলের অনুরোধটা ত রাখা দরকার।

মিনু ফুলদানিটা ধরে জানালার ধারে বসিয়ে দিলে। তারপর বললে, —"পড়ে যাও যদি!"

"না, পড়ব না। এই তলোয়ারের ফলাগুলো যদি একটু ফাঁক করে দাও, আমি বেরুতে পারি।"

নাঃ, ক্রমশ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মিনু অবাক হয়ে বললে,—"তলোয়ার কোথায়? পাতা বল।"

"না, পাতা হবে কেন, তলোয়ার! একটা রাজপুত্রের, একটা মন্ত্রীপুত্রের, একটা কোটালপুত্রের, একটা সদাগরপুত্রের!"

"সে আবার কি!" জিজ্ঞেস করলে মিনু, "তলোয়ার কোথা থেকে এল?"

"বাঃ, আমায় পাহারা দিতে তারা তলোয়ার পুতে রেখে গেছে জানো না!"

"না ত!"

"শুনবে তাহলে?"

মিনুকে কি আর দুবার বলতে হয়! সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে কেয়াফুলের পাতা, থুড়ি, তলোয়ারগুলি সরিয়ে ধরল।

ওমা! সত্যিই যে পালকের চেয়ে হাল্কা, ধোঁয়ার মত মিহি, রেশমের মত নরম, দুধের মত সাদা ওড়নায় ঢাকা, জোছ্‌নার মত সুন্দর একটি ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এসে জানালার ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে।

মিনু অবাক হয়ে বললে, "তুমি ছিলে ওই কেয়াফুলের ভেতরে?"

"আমি ছিলাম ওই কেয়াফুল হয়ে, কত বছর কত যুগ, তুমি ভাবতেই পার না।"

"কেন? কেন?"

"সেই গল্পই ত তোমায় বলছি। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির দেশ জান?"

"জানি না, তবে রূপকথায় যেন পড়েছি।"

"তোমরা আজকাল কিই বা জান!"

"বাঃ, আমাদের ভূগোলে কত দেশ আছে অদ্ভুত! বেচুয়ানাল্যাণ্ড, অ্যালাস্কা, ক্যামাস্‌ক্যাট্‌কা!

"ওসব নয়। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির দেশ কোথায় বলতে পার?"

"ও আমাদের ভূগোলে নেই।"

"তোমাদের ভূগোলে কিচ্ছু নেই!"

অন্য সময় হলে মিনু এত সহজে ভূগোলের অপমানটা হজম করত না, কিন্তু এখন তর্ক করলে গল্প শোনাটা যদি ফস্কে যায় এই ভয়ে সে চুপ করে রইল।

কেয়াফুল বললে—"সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির দেশের শেষে ঘুমন্ত পুরী।"

"ঘুমন্ত পুরী জানি। যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে, রাস্তায় লোকজন, রাজবাড়ির দরজায় সেপাই সান্ত্রী, দরবারে পাত্রমিত্র কোটাল মন্ত্রী রাজা; আর জলের মত পরিস্কার স্ফটিকের ঘরে আফোটা পদ্মের নরম বিছানার ওপরে ঘুমিয়ে আছে অপরূপ রাজকুমারী! তার পাশে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি পড়ে আছে। রূপোর কাঠি ছুঁয়ে সে ঘুমিয়েছে, সোনার কাঠি ছোঁয়ালে সে জাগবে। কিন্তু কে ছোঁয়াবে সোনার কাঠি! ঘুমন্ত পুরী পাহারা দেয় অগুণতি রাক্ষুসী। তারা দিনে চরে বেড়ায় দেশ বিদেশে, সন্ধ্যা হলেই কোথা থেকে দলে দলে এসে হয় হাজির। মানুষ তাদের চোখে দেখতে হয় না, নাকে শুঁকেই টের পায়!"

মিনু হাঁপিয়ে উঠে একটু থামল।

কেয়াফুলের মেয়ে একটু ভারী গলায় বললে, "তা হ'লে ত তুমিই সব জান, আমি আবার কি বলব!"

মিনু বুঝল ভারী ভুল হয়ে গেছে, গল্প বলতে বলতে মাঝখানে ফোড়ন দিলে ঠাকুমাই ত চটে যায়! কেয়াফুলের মেয়ে যে অভিমান করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

সে খুব অপরাধীর মত বললে, "না ভাই, আমি আর কি জানি! তোমার কাছেই ত শুনতে চাইছি।"

কেয়াফুলের মেয়ের মনটা হাজার হলেও নরম। এটুকুতেই গলে গিয়ে সে বললে, "না না, তুমি ত অনেকটা ঠিক বলেছ, তবে তোমরা ত সব জান না, আমাদের দেশের সব খবর তোমাদের দেশে কারা রটিয়েছে কে জানে!"

উৎসাহভরে মিনু সায় দিয়ে বললে, "তা হতে পারে। বাবা বলেন, খবরের কাগজেই রোজ কত ভুল খবর বেরোয়, যদুর ধড়ে রামের মাথা বসিয়ে। বাবা বলেন, তারা রামযদু তৈরী করে।"

কেয়া বললে, "তবে! তোমাদের নিজেদের খবরেই যদি এত ভুল, তাহলে আমাদের কথা তোমরা আর ঠিক কি করে জানবে! ঘুমন্ত পুরীতে কোথা থেকে এল এত ঘুম তা জান?"

মিনু যা জানত তা বললে হয়ত আবার কেয়া রাগ করবে! তাই সে সাবধান হয়ে বললে—"না ত!"

"ঘুমন্ত পুরীতে একলা কে জাগে, তাও জান না?"

মিনু অবাক হয়ে বললে—"কই না!"

"একলা জাগে রাজকন্যা নিজে! পুরীর মানুষ ঘুমে অসাড়, পুরীর পাথর ঘুমে অটুল, শুধু ঘুম নেই রাজকন্যার এক চোখে!"

"এক চোখে! সে আবার কি?"

"সেই ত গল্প! একদিন রাজপুরী ছিল জমজমাট। পথে হৈ হৈ রৈ রৈ, ঘরে ঘরে লোক থই থই, রাজপুরী গম গম করে রাত দিন! হঠাৎ একদিন রাজকন্যা বাগানে গিয়ে, না-জানি ফুলের দো-দানি পাতা ছিঁড়ে বসল।"

"তাতে কি?"

"বলছি ত, শোন না।"

"না-জানি ফুলের দো-দানি পাতা ত শুনিনি কখনো!" বলে ফেলেই মিনু বুঝল কাজটা ভাল হয়নি। কেয়া-মেয়ের ঠোঁট তখনই ফুলেছে।

"অত খিচ্ খিচ্ করলে গল্প হয় না।"

মিনু তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললে—"না, না, এইবারটি মাফ করো, আর বকব না!"

কেয়া অবশ্য তখ্খুনি খুশী হয়ে বলতে স্থুরু করলে—"পাতা ত নয়, জ্যোছনা রাতের দুই পরী দিনের বেলা গলা জড়াজড়ি করে পাতা হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ছিঁড়ে তারা মাটিতে পড়ল, মাটিতে পড়ে শামুক হল, শামুক হয়ে শাপ দিলে—"

"শামুক হল কেন?"

"বাঃ দিনের বেলায় কেউ ছুঁয়ে দিলেই ভাঙা চাঁদ পূরন্ত না হওয়া অবধি পরীদের যে শামুক হয়ে কাটাতে হয়। কোথায় চাঁদের আলোয়

হালকা পাখায় উড়ে বেড়াবে মনের খুশীতে, না শামুক হয়ে মাটির ওপর গুটি গুটি নড়তে হবে। পরীদের রাগ ত হবেই।"

তারা শাপ দিলে—এক ছিলাম দুই করলি, দিনে ছুঁয়ে ঘুম ভাঙ্গালি, দু'চোখের পাতা তোর এক হবে না!

রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। শাপের কথা শুনে রানী কাঁদেন, রাজা কাঁদেন, রাজ্য শুদ্ধ লোক কাঁদে। রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নেই।

দিন যায়, হপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, রাজকন্যা দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারে না। রাজা বৈদ্য ডাকলেন, রোজা ডাকলেন, কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন যাগ-যজ্ঞ করলেন, রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নামে না।

শেষে রাজা দেশ-বিদেশে ঢেঁড়া দিলেন, রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে মস্ত বখশিস।

বখশিসের বহর বেড়ে চল্‌ল। মোহরের থলের বদলে মণিমুক্তো, মণিমুক্তোর জায়গায় হীরে-মাণিক। কিন্তু কেউ রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে না।

কত গুণী এল, ওঝা এল, নামের চেয়ে উপাধি বড় বৈদ্য এল, রাজকন্যার হয়রানিই সার। কেউ সারা দিন রাত মন্ত্র পড়ে। কেউ হরেক রকম খাওয়ায়, রাজকন্যা তবু ঘুমের উপোসী। দিনে দিনে রাজকন্যা শুকিয়ে কাঠিটি হয়ে গেল।

রানীর চোখে জল শুকায় না, রাজা ভেবে সারা। বলেন অর্ধেক রাজত্ব দেব মেয়ে যদি ঘুমোয়। এমন সময় রাজপুরীর টিকারায় ঘা।

কে আসে! কে আসে! নিশুত নগরের মস্ত গুণী আসে। কিন্তু বড় বেশী তার খাঁই। অর্ধেক রাজত্বে তার কাজ নেই, ঘুম পাড়িয়ে স্বয়ং রাজকন্যাকে সে চায়। তাও বড় সহজ শর্তে নয়! —নিশুত রাতে একলা আসবে, রাজকন্যার ঘরে একলা জাগবে। চোখে যদি কেউ চেয়ে দেখে তা হলে আজীবন তার অনিদ্ কাটবে, আর সমস্ত পুরীর ঘুম আর যুগ-যুগান্তরে ভাঙবে না।

রাজা অনেক ভাবলেন, অনেক চিন্তোলেন। কিন্তু উপায় ত আর নেই, রাজী তাঁকে হতেই হ'ল।

নিশুত রাতে রাজপুরীতে টুঁ শব্দটি নেই। সবাই আছে যে যার ঘরে চোখ বুজে। দেউড়িতে পায়ের আওয়াজ, পায়ের আওয়াজ স্ফটিকের সিঁড়িতে। রাজকন্যার বুক কাঁপছে পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের আওয়াজ ঘরের কাছে। রাজকন্যা চোখ বুজল, পালঙ্কের পাশে খস্‌খস্ ফোঁসফোঁস, কার বুঝি ভারী নিশ্বাসের শব্দ।

"রাজকন্যা, চোখ যেন খুলো না!"

না, রাজকন্যা চোখ কিছুতেই খুলবে না। ঘরে কিসের ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ, গন্ধ নয় বুঝি ঘুমেরই ঘোর, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঝিমিয়ে আসে গা, ঘুমের সাগর উথলে উঠছে, ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে পায়ের কাছে, ঢেউ এল হাঁটুর ওপর, ঢেউ গেল কোমর ছাড়িয়ে, হিমের মত ঠাণ্ডা ঢেউ গলার কাছে খেলা করে, রাজকন্যার সকল দেহ এলিয়ে পড়েছে, হিমেল ঘুমের ঢেউ এগিয়ে আসে।

"রাজকন্যা, চোখ খুলো না!"

কিন্তু রাজকন্যা আর কি পারে! দুটি চোখ ঘুমে এসেছে জড়িয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে একবার না দেখে যে থাকা যায় না।

রাজকন্যা একটি চোখ বুজে একটি চোখ খুলে তাকাল! সঙ্গে সঙ্গে বুকের রক্ত হিম! রাজকন্যা আঁৎকে উঠে চীৎকার করলে।

আঁৎকে উঠল কি সাধে! মেঝেয় কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছাদ পর্যন্ত বিরাট ফণা তুলে অজগরের রাজা নাগেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে আছে!

চোখাচোখি এক পলক শুধু, হঠাৎ ঘরের বাতি নিভল, জানালা দরজা আছাড় খেল ঝড়ের দাপটে।

অন্ধকারে শোনা গেল শুধু দারুণ স্বর—

"যে চোখে দেখেছ, সে চোখে জাগবে,
নিঝুম পুরীর ঘুম আর না ভাঙবে।"

রাজকন্যা কেঁদে ফেলে বললে, "আর কি তবে উদ্ধার নেই?"

অট্টহাসির সঙ্গে শোনা গেল, "আছে, যদি আমার রানী হও এখন।"

রাজকন্যা শিউরে উঠে বল্লে—"না, না! সে হয় না!"

—"তবে যেমন আছ তেমনি থাক, যতদিন না—

জলের তলায় আগুন জ্বলে,
সে আগুনে শিলা গলে।"

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি শোনা গেল!

সেই থেকে রাজকন্যা এক চোখে জেগে কাটায়; রাজপুরীর ঘুম আর ভাঙে না।

রাজকন্যা জানে উদ্ধার আর নেই। জলের তলায় আবার আগুন কেউ জ্বালতে পারে নাকি! আর পারলেও ঘুমন্ত পুরীতে আসছে কে!

মাস যায়, বছর যায়, ঘুমন্তপুরী জড়িয়ে ওঠে কাঁটা লতার জঙ্গল। ভয়ে সেখানে কেউ ঘেঁসে না।

মিনু এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনছে, এইবার উৎসুক হয়ে বললে—"কেন, রাজপুত্র কোথায় গেল?"

কেয়াফুল একটু চুপ করে থেকে বললে—"কোথায় আর যাবে! রাজপুত্র সবে পথে বেরিয়েছে, দুয়োরানীর ছেলে বলে সুয়োরানী রাতদিন দূর দূর করেন, রাজা চোখে দেখেও কিছু করতে পারেন না। মনের দুঃখে রাজপুত্র ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে নিশুতি রাতে যে দিকে দুচক্ষু যায় বেরিয়ে পড়েছে। দুচক্ষু আর কোথায় যায়! পুরীর বাইরে মশান; রাজপুত্র সেই দিকে চলেছে। মশানের মাঝে পথ আগলে কোটালপুত্র দাঁড়িয়ে।

"কোথায় যাবে বন্ধু?"

"যে দিকে দু চক্ষু যায়।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

রাজপুত্রের কোন মানা না শুনে কোটালপুত্র সঙ্গে চলে। মশান ছাড়িয়ে শ্মশান, সেখানে আর দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে—মন্ত্রীপুত্র আর সদাগরপুত্র। কোন মানা তারা শুনল না। রাজপুত্রের সঙ্গে তারা দেশান্তরী হবেই।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিতার আগুন সাক্ষী করে চার বন্ধু প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে মরণে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

তারপর চার বন্ধু কত দেশ কত বন কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে, পেছন ফিরে আর তাকায় না।

শেষে একদিন ঘুরতে ঘুরতে................

মিনু তাড়াতাড়ি বললে—"ঘুমন্তপুরী!"

কেয়াফুল অবাক হয়ে বললে—"কি করে বুঝলে? আমি ত বলিনি!"

মিনু গম্ভীর হয়ে বললে—"আমি ও সব বুঝতে পারি।"

কেয়াফুল বোধহয় খুব অবাক হয়েছিল। সে খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে সুরু করলে—"ঘুমন্ত পুরীর সে কি হাল! তার দেয়াল টলমল পড়ে পড়ে, তার ঘর দোর জঙ্গল ঝোপে ঝাড়ে!

তবু রাজপুত্রের কেমন সখ—ভেতরে যাবে। বন্ধুরা মানা করে, রাজপুত্রের সেই এক গোঁ। কি আর করে, চার বন্ধু মিলে তলোয়ারে জঙ্গল সাফ্ করতে করতে ভেতরে ঢুকল। যে দিকে চায় জানালা দরজা খসে পড়েছে, ছাদ দেয়াল ধসে পড়েছে। তারই ভেতর ঘরে ঘরে মরা মানুষ!

কি আশ্চর্য! মরা ত নয়, জ্যান্ত মানুষ! মরা হলে কবে পচে খসে যেত। জ্যান্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে অঘোর ঘুমে।

চার বন্ধু এক এক করে সব ঘর দালান ঘুরে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। ঘরের পর ঘর ঘুরতে ঘুরতে—"

মিনু বললে—"রাজকন্যার ঘরে—"

কেয়া বললে—"তুমি ত ঠিক ধরতে পার! রাজকন্যা এক চোখে ঘুমোয় আর এক চোখে জাগে। ঘরের ভেতর চার বন্ধুকে দেখে অবাক! ঘুমের চোখে স্বপ্ন, না, জাগার চোখে সত্যি দেখছে ভেবে পায় না।

চার বন্ধু ত অবাক। মণি-মাণিক্যের পালঙ্কে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা একচোখে চেয়ে আছে—এ আবার কে!

রাজপুত্র এগিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললে—"অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছি, এমন পুরী দেখিনি। কেন তোমাদের এমন দশা?"

ঘুমের চোখে স্বপন নয়, জাগার চোখে সত্যি দেখা!

রাজকন্যা চমকে উঠে বললে—"সে কথা শুনে কাজ নেই, নাগেশ্বরের পুরী অজগর পাহারা, এক্ষুনি পালাও, নইলে মারা পড়বে!"

চার বন্ধুর তবু জেদ, সব কথা না শুনে তারা যাবে না।

কি আর করে, রাজকন্যা দুচার কথায় সব বুঝিয়ে দিলে। বলতে বলতে গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল।

চার বন্ধু বললে—"কেঁদো না রাজকন্যা। আমরা তোমায় উদ্ধার করব।"

রাজকন্যা দুঃখের হাসি হেসে বললে—"আমার উদ্ধার হবে না। জলের তলায় আগুন জ্বলবে, সে আগুনে শিলা গলবে, তবে আমার উদ্ধার! সে ত আর হবার নয়!"

রাজপুত্র খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভেবে নিয়ে হেসে বললে—"এই কথা! এ আবার শক্ত কি! তোমার উদ্ধার হয়ে গেছে তাহলে।"

রাজকন্যা বড় দুঃখেও হেসে ফেললে রাজপুত্রের কথায়। রাজপুত্রের কাণ্ড দেখে আরো অবাক!

ঘরে ছিল স্ফটিকের পাত্র। রাজপুত্র তাতে জল ভরল। কোটাল-পুত্রকে বললে, হাতে করে ধরে থাক। তারপর শুকনো ঘাস পাতা কুড়িয়ে আনলে মন্ত্রীপুত্র। সদাগরপুত্র চক্‌মকি ঠুকে স্ফটিকের পাত্রের তলায় আগুন জ্বাললে। ঘরে ছিল বাতিদানে মোমের বাতি, রাজপুত্র খুলে নিয়ে সে আগুনে গলিয়ে ফেললে।

কাণ্ড দেখে রাজকন্যা হেসেই খুন। হাসতে হাসতে রাজকন্যা উঠে বসল। বসে বললে—"এতেই যদি শাপ খসে যেত!"

"খসে যেত কি, গেছে ত!"

তাইত! অবাক কাণ্ড! রাজকন্যা হাসতে হাসতে যে উঠে বসেছে! শুধু কি রাজকন্যা! পুরীর লোকজন সবাই উঠে বসে অবাক্!

থম্ থম্ পুরী গম্ গম্ করে উঠল। রাজকন্যা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ রাজকন্যার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। পুরীর চারিধারে হিস্ হিস্, ফোঁস ফাঁস, হাওয়ায় ভেসে আসে হিমেল নিশ্বাস!

নাগরাজ ক্ষেপে আসছে ছুটে, সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ।

"পালাও, বন্ধুরা পালাও।" রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল।

"যদি যেতে হয় তোমায় সঙ্গে না নিয়ে যাব না।"

চার বন্ধু রাজকন্যার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বাইরে চার বন্ধুর ঘোড়া বাঁধা। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে উঠল নিজের ঘোড়ায়। পিছনে তিন বন্ধু।

ঘোড়া ছুটছে হাওয়ার আগে। মাঠ বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত পেরিয়ে চার বন্ধু চলেছে রাজকন্যাকে নিয়ে।

কিন্তু কতদূর আর যাবে! নাগরাজের মায়ার ত শেষ নেই। তার হাত থেকে কি নিস্তার আছে! দেখতে দেখতে তেপান্তরের মাঝে অকূল নদী জেগে উঠল পথ রুখে।

ফেরাও ঘোড়া, ফেরাও ঘোড়া! ফেরাবে আর কোথায়! পেছনে নাগরাজের চর অনুচর, নাগ-নাগিনী ছুটে আসছে, সামনে অকূল নদীতে দুরন্ত বান।

"কি হবে রাজপুত্র?"

চার বন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

"ভয় নেই রাজকন্যা, তোমায় আমরা রক্ষা করব।"

চার বন্ধু রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাটিতে গেঁথে রাজপুত্র বললে "এই রইল তোমার চিরদিনের পাহারা" মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্রও নিজের নিজের তলোয়ার খুলে চার ধারে পুতে দিলে।

"নির্ভয়ে থাক রাজকন্যা, এ তলোয়ারের বেড়া ডিঙোবার সাধ্য কারুর নেই।"

রাজকন্যা কেঁদে উঠে বললে, "কিন্তু তোমাদের কি হবে!"

"আমাদের?" চার বন্ধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে। মন্ত্রীপুত্র বললে— "আমি পবন-মন্ত্র জানি, ঝড় হয়ে বইব।" কোটালপুত্র বললে,—"আমি মেঘ-মন্ত্র জানি, মেঘ হয়ে আকাশ ছেয়ে দেব।" সদাগরপুত্র বললে— "আমি বরুণ মন্ত্র জানি, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব।"

আর রাজপুত্র!

রাজপুত্র বললে,—"আমি বিদ্যুৎমন্ত্র জানি, বজ্র হয়ে জ্বলে উঠব। শোন রাজকন্যা, আমাদের একসঙ্গে দেখা না পেলে মুখ তুলো না।"

মিনু প্রায় চুপি চুপি বললে—"তুমি বুঝি সেই রাজকন্যা?"

"আমিই সেই রাজকন্যা ঘুমন্তপুরীর। নাগেরা আমায় ঘিরে থাকে তবু তলোয়ারের বেড়া ডিঙোতে পারে না। চার বন্ধু যেদিন একসঙ্গে দেখা দেয়, সেদিন আমি মুখ তুলে চাই, গন্ধে জানাই মনের কথা।"

কড় কড় কড়াক্কড়! হঠাৎ বাজের শব্দে মিনু চমকে জেগে উঠে বসল বিছানায়। ওমা! কোথায় গেল রাজকুমারী! কোথাও কেউ যে নেই!

কেয়া ফুলের গন্ধে ঘর শুধু আমোদ হয়ে গেছে।



হারুর হঠাৎ হল কি?

কদিন ধরে তাকে আর দলে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদেরও সব মজা প্রায় মাটি।

হারু হ'ল আমাদের সর্দার। সে না হ'লে কোন খেলাই জমে না।

আমাদের তিন হাত চওড়া গলিতে ক্যাম্বিশের বল নিয়ে ফুটবল খেলতেও সে না হলে চলে না, রাত্তির বেলা আমাদের গলির পোড়ো বাগান-বাড়িটায় লুকোচুরি খেলতেও সে না থাকলে কারুর সাহসে কুলোয় না। পাড়ার সমস্ত ওয়ারিশ বেওয়ারিশ কুকুর জড় করে গলায় নম্বর বেঁধে ঘোড়দৌড় করাবার কল্পনা সে ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরোয়!

সেই হারুর হল কি? কদিন থেকে বড় যেন গম্ভীর। আমাদের কাছেই ঘেঁসে না। দেখা পাওয়াই শক্ত। পেলেও বোঝা যায়, কি এক গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই।

না, এটা ঠিক বৈরাগ্য গোছের কিছু নয়। ক্লাশে সে ঠিকই উঠেছে, বাড়িতে বকুনিও কিছুর জন্যে খায় নি। বাড়ির একমাত্র আদুরে ছেলে, বকুনি সে কখনো খায় না বললেই হয়।

কি যে হারুর হয়েছে দুদিন বাদে একটু যেন আঁচ পাওয়া গেল।

শনিবার দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় জোর করে হারুর সঙ্গ নিয়েছি, তার ঔদাসীন্য অগ্রাহ্য করে।

"চোর পুলিশ খেলবি আজ?" একবার গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসাও করেছি।

"চোর পুলিশ!" হারু এমন ভাবে একটু হেসেছে যেন এসব ছেলেমানুষি খেলার সে অনেক ওপরে।

খানিক বাদেই কিন্তু তার রহস্য খানিকটা ধরা পড়ল।

গলিতে ঢোকবার মুখেই হঠাৎ দেখি সে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওকি! দাঁড়ালি কেন? চল!"

"চুপ! ভাবতে দে।"

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভাববার কি হল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাববার হঠাৎ হল কি!"

"কি হল? এই মাত্র যে লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাকে লক্ষ্য করেছিস্?"

"লক্ষ্য করব! কেন?"—আমি সবিস্ময়ে বললাম, "ও ত ফিরিওয়ালা একটা। প্রায়ই এ পাড়ায় শাড়ী ধুতি বোম্বাই চাদর ফিরি করতে আসে!"

"হুঁ, তা ত আসবেই! সেই জন্যেই ওর গায়ে ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগালাম!"

বোঁচকা ঘাড়ে ফিরিওয়ালার সঙ্গে সখ করে ধাক্কা লাগাবার সুখটা যে কি, কিছু বুঝতে না পেরে থ হয়ে গেলাম।

করুণা করে হারুই এবার একটু ব্যাখ্যা করে দিলে—"ধাক্কা লাগতেই লোকটার চাউনিটা কি রকম হ'ল দেখলি!"

"দেখলাম ত! প্রায় মারে আর কি!"

"ওই ত!" হারু গর্বের হাসি হেসে বললে, "তোদের এখনো চোখই তৈরী হয় নি। সকলের হয় না। খুঁটিনাটি অনেক কিছু একবার চেয়েই যদি না ধরা যায় তাহলে চোখ কিসের!"

"তোর চোখে কি ধরা পড়ল শুনি?"—আমার প্রশ্নটা খুব প্রসন্ন স্বরে বেরুল না।

হারুর সেই বিজ্ঞের হাসি—"লোকটা ফিরিওয়ালা নয়।"

"ফিরিওয়ালা নয় ত কি?"—আমি অবাক।

"কোনো রাজ্যের গুপ্তচর। এখানকার সব বড় বড় ঘাঁটির ফটো তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। ধাক্কা দিয়েই বুঝলাম কি একটা শক্ত জিনিস পুঁটলির মধ্যে রয়েছে। সেটা ক্যামেরা।"

এক সঙ্গে এতগুলো রহস্যে একটু দিশাহারা হয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম—"কিন্তু আমাদের এ গলিতে কেন? এখানে আবার বড় ঘাঁটি কোথায়?"

হারু অবজ্ঞাভরে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করল না এ বাজে প্রশ্নের।

হারুর দল ছাড়ার রহস্য তার পরদিনই পরিষ্কার হল। হারুর অনেক বিদ্যার কথা জানা ছিল, সে যে একজন গোয়েন্দা এই খবর শুধু পাইনি।

খবরটা হারুর কাছেই পেলাম অবশ্য। আমাকে সাকরেদ করতে স্বীকার ক'রে অত্যন্ত গোপনে সে ব্যাপারটা আমায় জানালে। গোয়েন্দা হবার জন্যে অনেককাল ধরেই সে নাকি সাধনা করছে লুকিয়ে। এইবার তার কাজে নামবার পালা।

হারু গোয়েন্দা হওয়ার ফলে দিনগুলো প্রথম নেহাৎ মন্দ কাটতে লাগল না।

আমাদের নিতান্ত নগণ্য বেচু পরামাণিকের গলির ভেতর এত রহস্য রোমাঞ্চ লুকিয়ে ছিল কে জানত!

আমাদের গোয়েন্দার দপ্তর দিন্‌দিন্‌ই মোটা হয়ে উঠতে লাগল।

আর রহস্যজনক জিনিসের সংগ্রহের ত কথাই নেই। হারুর মার কাছে কাকুতি মিনতি করে চেয়ে আনা হাতবাক্সে আর কুলোয় না।

জিনিসই কত রকমারি। হারু ত কিছুই ফেলবার পাত্র নয়। পুরোন কটা ছেঁড়া হ্যাণ্ডবিল, কার একপাটি ছেঁড়া জুতো, মরচে ধরা একটা ভাঙা চাবি, শেষকালে খালি দেশলাইএর বাক্স পর্যন্ত।

খালি দেশলাইএর বাক্সটায় আমি মৃদু আপত্তি জানাতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম।

"তুই এ সবের বুঝিস কি? কিসে যে কি কাজ হয়, কে বলতে পারে? এই খালি দেশলাইএর বাক্স থেকে একটা খুনের কিনারা হয়ে যেতে পারে, জানিস্?"

সভয়ে নিবেদন করেছিলাম—"কিন্তু খুনটা ত আগে হওয়া দরকার! এ অঞ্চলে কোথাও কোন খুনোখুনির খবর ত কই পাওয়া যায়নি!"

কিন্তু হারু সামান্য একটা খুনের অভাবে হার মানবার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ খিঁচিয়ে উঠেছিল আমায়—"খবর পাওয়া যায় নি ত হয়েছে কি? খবর কি সব আগে পাওয়া যায়! তা ছাড়া বদমায়েসরা খুন জখম করবার ঢের আগে থেকে ফন্দি আঁটে তো জানিস! সেই ফন্দিটা ধরতে পারাই হ'ল বাহাদুরি।"

আর কিছু বলা নিরাপদ নয় জানা সত্ত্বেও মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছল—"কিন্তু ওই দেশলাইএর বাক্সটায় খুনোখুনির কোন ফন্দি আছে নাকি? খানিক আগে হাবুলের বাবাকেই ওটা ফেলে দিতে দেখলাম যে!"

হাবুলের বাবা পাড়ার নেহাৎ নিরীহ ভদ্রলোক। দু পায়ে গেঁটে বাত বলে নিজের বাড়ির রক থেকে বড় নামেন না। হারু এক সেকেণ্ডের জন্যে গুম্ হয়ে গিয়ে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল তার পর—"অত যদি আমার ওপর অবিশ্বাস, আমার সঙ্গে থাকবার দরকার কি? গোয়েন্দাগিরি যার তার কর্ম নয়!"

এর পর হারুকে আর ঘাঁটাবার সাহস হয় নি।

তার কথাই নির্বিবাদে মেনে তার সাকরেদি করে চলেছি।

ইস্কুলের ছুটির পর ফুটবলের মাঠটার দিকে মনটা ছুটলেও সে কথা ঘূণাক্ষরেও হারুকে জানতে দিই না।

হারু এখন ও সব তুচ্ছ ছেলেমানুষী খেলাধূলোর অনেক ওপরে। সারা বিকেলটা হারুর সঙ্গে সঙ্গে 'রোঁদে' ঘুরে বেড়াতে হয়, অনেক কিছুর ওপর নজর রাখতে, আর যাকে বলে 'ক্লু' সংগ্রহ করতে। 'ক্লু' কথাটা হারুর কাছে শিখেছি। কোথায় কি হচ্ছে বা হবে তার হদিস্ দেবার টুকিটাকি হ'ল 'ক্লু'। আর এই 'ক্লু' চেনাতেই নাকি গোয়েন্দাদের বাহাদুরি।

'ক্লু' চেনা যে কত শক্ত, হারুর সঙ্গে ঘুরে তা পদে পদেই টের পাই।

রাস্তার ধারে খানিকটা সিগারেটের বাক্সের ভেতরকার রাঙতা পড়ে আছে হয়ত। হারু সেটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেয়। ঝাঁপিয়ে পড়ার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ধারে কাছে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার মত কোন লোকই নেই। তবু 'ক্লু' সংগ্রহ করতে ওই রকম ঝাঁপিয়ে পড়াই বোধহয় নিয়ম।

রাঙতাটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে হারু সেটা আমার হাতে দিয়ে হুকুম করে—'নে, রাখ।'

'ক্লু' বইবার ভার আমার ওপর। ক্লু হিসেবে রাঙতার দামটা যে কি সে বিষয়ে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন জিভের ডগা পর্যন্ত এগিয়ে এলেও ঢোক গিলে আবার সেটাকে নামিয়ে দিয়ে রাঙতাটা থলিতে চালান করি। হ্যাঁ, থলি একটা সঙ্গে থাকে, আর থলিটা প্রায় প্রতিদিনই ছেঁড়বার উপক্রম।

কিন্তু তার পরই আমার গোয়েন্দাগিরি প্রায় শেষ হবার জোগাড়।

হঠাৎ মোক্ষম একটা 'ক্লু' পেয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি রাস্তার ওপরে।

রাঙতাটা যা থেকে বেরিয়েছে সিগারেটের সেই খালি বাক্সটাই পেয়ে গেছি!

সাগ্রহে সেটাকে তুলে ধরে, যতরকমে সম্ভব সেটা পরীক্ষা করে

দেখি। মায় শুঁকে পর্যন্ত। এটা হারুর ওপর একটু টেক্কা দেওয়া। রাঙতার বেলা শুঁকে দেখাটা হারুর বাদ ছিল।

পরীক্ষা শেষ করে সগর্বে খুশি মনে বাক্সটা থলিতে ভরতে যাচ্ছি হঠাৎ হারু বলে ওঠে—"ওটা কি হচ্ছে কি?"

হারুর বলার ধরণটা আমার ভালো লাগে না, কটমট করে তার তাকাবার ধরণটাও।

"কেন? ক্লু রাখছি!"

"দেখি।" বলে হারু তাচ্ছিল্য ভরে হাত বাড়ায়।

মূল্যবান ক্লুটা অমন তাচ্ছিল্য ভরে নেওয়াটা আমার পছন্দ হয় না। তবু তার পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

নিতান্ত অবজ্ঞাভরে একবার হাতে নিয়ে দেখেই হারু সেটা ফেলে দেয়।

আমার বিদ্রোহও ফেটে বেরোয়—"ফেলে দিলে যে!"

"দিলাম ওটা কিছু নয় বলে!"—হারু নির্বিকার।

"তোমার রাঙতাটা ক্লু, আর আমার সিগারেটের বাক্সটা কিছু নয়?"—আমি বেপরোয়া বলে ফেলি।

হারু বিজ্ঞের মত একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে। "ক্লু চেনা যদি অত সহজ হত, তাহলে সবাই গোয়েন্দা হতে পারত, বুঝেছিস্!"

"তাহলে তুমি একলাই গোয়েন্দা হয়ে থাকো, আমার দরকার নেই।" মরিয়া হয়ে এত বড় কথাটা বলে দিয়ে থলেটা তার সামনে ফেলে দিয়ে হন হন করে আমি চলে যাই।

কত দূর যেতাম বলতে পারি না। গলির শেষটা পর্যন্ত নিশ্চয়।

কিন্তু অত দূর যেতে হয় না। আমার পা ফেলার তালটা খুব বেশী ঢিমে হবার আগেই হারুর ডাক শোনা যায়।

"শোন্।"

এ ডাক অবহেলা করে আর একটা ডাকের আশায় এগিয়েও যাওয়া যায় আর একটু। কিন্তু তার চেয়ে মান থাকতে ফেরাই ভালো।

গুটি গুটি ফিরেই আসি।

“কি? ডাকলি কেন?”—গলাটা যথাসম্ভব কড়াই রাখি।

“হুঁঃ”—হারুরও একেবারে নুইলে চলে না।—“ঠর ঠর করে চলেই গেলি যে বড়!”

“যাব না ত কি করব! আমার ‘ক্লু’ যখন কিছু নয়, আমি গোয়েন্দাগিরির কিছু বুঝি না যখন, তখন কি দরকার তোমার থলি বইবার!”

হারুর আর একবার নাকী অব্যয় শব্দ,—“হুঁঃ! গোয়েন্দা হতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, বুঝেছিস্? চট করে চটলেই হয় না। আমি তোকে তাই পরীক্ষা করছিলাম।”

“পরীক্ষা?”

“হ্যাঁ, কতরকম পরি, পরি—”

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—“পরি? গোয়েন্দাগিরিতে পরি আবার কোথা থেকে এল?”

“আহা পরি নয়।” হারু বিরক্ত হয়ে বলে—“বলছিলাম কি, পরিস্থা,—না, না—কি বলে যে, বল না!”

“পরিস্থিতি?”—বাঙলায় আমার দখল যে বেশী তার প্রমাণ দিই।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতরকম পরিস্থিতি হতে পারে। চটে উঠলেই গোয়েন্দাগিরি খতম। তাই দেখছিলাম তোর মাথা কতটা ঠাণ্ডা। নইলে ওটা যে একটা মোক্ষম ক্লু, আমি আর জানি না! দেখেই আমি বুঝেছি।”

মিটমাট অতি সহজেই তারপর হয়ে যায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্বন্ধে আমি সাবধান হবার কড়ার করি। ‘ক্লু’ সম্বন্ধে আমার মতামতের মূল্য হারু স্বীকার করে।

কিন্তু তারপরই আমাদের গোয়েন্দাগিরির অগ্নিপরীক্ষা।

‘রোঁদে’ বেরিয়ে ক্লু সংগ্রহ করাটা একটু বুঝি একঘেয়ে হয়ে আসছিল, এমন সময় মস্ত একটা কেস’ আমাদের হাতে এসে গেল।

আমাদের মানে অবশ্য হারুর। কেসটা সেই কুড়িয়ে আনল বলা চলে।

আমাদের গলির পোড়ো বাড়িটাতেই আমাদের গোয়েন্দাগিরির গোপন পরামর্শ আজকাল হয় বিকেলের টহলদারির পর।

আমার একটু গা ছমছম করে না তা নয়।

মৃদু প্রতিবাদও দুএকবার জানিয়েছি। গোয়েন্দারা ত চোর-ডাকাত নয় যে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে আড্ডা গাড়তে হবে! হারুর পড়ার ঘরেই ত আমাদের সভা করলে হয়। সেখানে কেউ বিরক্ত করবারও নেই। কিন্তু হারুর তাতে মত নেই। আমাদের পেছনেও নাকি ভয়ঙ্কর সব শত্রুদের চর রাতদিন ঘুরছে।

তাদের নজর এড়াবার জন্যেই এরকম গুপ্ত ঘাঁটি দরকার।

প্রকাণ্ড একটা পুরানো জংলা বাগানের মধ্যে সেকেলে বিরাট একটি পোড়ো বাড়ি। বড়দের মুখে শুনি পাঁচভাগে পড়ে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুণই নাকি বাড়ি বাগানের এই দুর্দশা। কেউ ছোঁবেও না, ছাড়বেও না।

ঘর দালান সব প্রায় ভেঙে পড়েছে। একটি কুঠ্রি ওরই মধ্যে ভালো। তারই ভাঙ্গা দরজায় খিল দিয়ে আমাদের গোয়েন্দা সভা বসে। আমাদের যত ক্লু সেই ঘরেই জমা করা।

সেদিন হারু যে ক্লু নিয়ে এল আমিও দেখে অবাক। পোস্টকার্ডে লেখা তিনটে চিঠি। শুধু চিঠি নয়, হারুর হাতে একটা ভাঙ্গা আতসী কাচও। তাই দিয়ে মোমবাতির আলোয় চিঠিগুলো সে দেখছে ত দেখছেই। শেষে আর ধৈর্য রইল না।

"কাচ দিয়ে অত কি দেখছিস্ তুই? শুধু চোখেই ত সব পড়া যায়! তোর বাবাকে লেখা চিঠি। তাঁর কে মেসোমশাই লিখেছেন!"

গম্ভীরভাবে হারু বললে—"তা ত লিখেছেন, কি লিখেছেন কিছু বুঝলি?"

"বাঃ, তা বুঝব না কেন! প্রথম চিঠিতে এখানে একটা বাড়ি কিনতে আসবেন লিখেছেন। পরের চিঠিতে যেদিন আসবার কথা সেদিন আসতে পারলেন না জানিয়েছেন। আর তার পরের চিঠিতে আবার কবে আসবেন সেই তারিখটা জানিয়েছেন। কালই ত আসছেন দেখছি!"

"হু, আসছেন ত বটে, কিন্তু কে?"

"কেন? তোর বাবার মেসোমশাই, মানে তোর দাদু হ'ন।"

হারুর মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম, নিতান্ত বোকার মত চিঠির মর্ম কিছুই বুঝতে পারিনি। হারু সেটা এবার বুঝিয়ে দিলে পরিষ্কার করে।

চিঠিগুলোর ভেতর অমন সাংঘাতিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে কে জানত! আতসী কাচ আর হারুর বুদ্ধিতেই ধরা পড়েছে।

প্রথম দুটো চিঠি যাঁর লেখা তৃতীয়টা যে তাঁর নয়, হাতের লেখা দেখলেই নাকি তা বোঝা যায়। সুতরাং ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র এর ভেতর আছে!

ষড়যন্ত্রটা কি হারুও ঠিক বোঝাতে পারল না। কিন্তু ষড়যন্ত্র না থাকলে হাতের লেখা আলাদা হবে কেন? হাতের লেখা আলাদা কিনা আমি অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি ত আর হারুর মত হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট অর্থাৎ হাতের লেখা চেনার ওস্তাদ নই।

এতবড় ষড়যন্ত্রের ক্লু পেয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। ঠিক হয়ে গেল পরের দিন আমরা হাওড়া ষ্টেশনেই যথাসময়ে হাজির থাকব।

"কিন্তু সেখানে করব কি?"

"সে আমি বলে দেব'খন।"

"কিন্তু দাদুর বদলে যিনি আসছেন তাঁকে চিনবি কি করে?"

হারু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে—"তাহলে আর হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট কিসের? হাতের লেখা দেখলে চেহারাও বলে দেওয়া যায়। দাদুর চেহারা হ'ল বেঁটে, কালো, মাথায় টাক। মুখে কাঁচা পাকা গোঁফ—

বাধা দিয়ে বল্লাম—"আহা দাদুর চেহারা ত তুই জানিস্।"

"জানি মানে? এ দাদুকে দেখিইনি কখনো! আমার জন্মের পর তিনি কলকাতায় আসেননি কখনো। কিন্তু হাতের লেখা দেখেই চেহারা বুঝতে পারছি, যেমন শেষ চিঠির হাতের লেখা দেখে বুঝছি

লোকটা রোগা, একটু কুঁজো, বেশ ফিটফাট পোশাক, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে একটা ছড়ি।”

থ’ হয়ে গিয়ে বললাম, “হাতে ছড়ি কি করে বুঝলি! ওটা ত আর চেহারা নয়!”

হারু গম্ভীর মুখে বললে—“আমরা ওরকম বুঝতে পারি!”

আমরা বলতে হয়ত অমাকেও বাদ দেয়নি এই আশায় চেপেই গেলাম পরের কথাটা।

পরের দিন স্টেশনে যথাসময়ে হাজির হয়ে কিন্তু রোগা, কুঁজো, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে ছড়ি, একটা লোককেও ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম না।

হারুর হুকুম তবু অক্ষরে অক্ষরে না মানলে নয়। রোগা ফর্সা না হোক, চোখে চশমা হাতে ছড়ি একজনকে দেখে, পাশে যেতে যেতে চাপা গলায় বললাম,—“সাবধান! আমরা সব জানি!”

হারুর এইরকমই আদেশ ছিল।

যাত্রীদের ভীড়ে কুলিদের হট্টগোলে ভদ্রলোক কথাটা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। কুলির পেছনে হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু শিকার এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কোন রকমে ভীড় কাটিয়ে দৌড়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললাম আবার—“সাবধান! আমরা সব জানি।”

“কি বললে, খোকা!”—ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাতেই মনে হল আর সেখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। ছুটে প্লাটফর্মের অন্য প্রান্তে হারুর খোঁজে গিয়ে দেখি তার অবস্থা আমার চেয়ে কাহিল!

একজন ভদ্রলোক তার হাত ধরে আছেন, আর অনেকে তার চারিধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তারই মাঝে একটু উঁকি দিয়ে দেখি ভদ্রলোক হারুকে ধমকাচ্ছেন—“পাজি হতভাগা ছেলে! ইয়ার্কি

করবার আর জায়গা পাওনি! কি করতে প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছিলে? পকেট কাটতে না চুরি করতে?"

ভিড়ের ভেতর নানাজনের নানা মন্তব্য—"দিন না মশাই পুলিশে ধরিয়ে! কার পকেট কেটেছে? কত টাকা ছিল? পেয়েছেন মাল?"

"আরে থামুন মশাই, থামুন!" ভদ্রলোক ভীড়ের লোকদেরও ধমকালেন—"এ পকেট কাটার কেস নয়, তারচেয়ে ঘোরালো।"

"কি হয়েছে কি?"—অনেকের সাগ্রহ প্রশ্ন।

"আরে মশাই সুটকেশটা নিয়ে এগোচ্ছি, এমন সময়ে শুনি পাশে কে বলছে,—সাবধান আমরা সব জানি। ফিরে চেয়ে দেখি এই মূর্তিমান!"

সবাই হেসে উঠল। ভদ্রলোক আবার হারুকে নিয়ে পড়লেন। "বল, কি করছিলে প্ল্যাটফর্মে! কি মানে ও কথার?"

হারু একেবারে চুপ! চেহারাটা সে ঠিকই চিনে বার করেছিল। হাতে ছড়ি না থাক, ভদ্রলোক রোগা লম্বা ফর্সাই বটে, চোখে চশমা পর্যন্ত আছে। কিন্তু ধরতে গিয়ে ধরা পড়েই যা ফ্যাসাদ বেধেছে।

চুপ করে থাকলেও ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। আবার তিনি ধমকে উঠলেন—"বল, কি তোমার নাম। মিথ্যে বললে পুলিশে দেব।"

হারু ভয়ে ভয়ে এবার নাম বললে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

"বাবার নাম কি? কোথায় থাকো?"

হারুর উত্তর শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন।—"কি বললে? তুমি সলিল চাটুজ্যের ছেলে? সাত নম্বর বেচু পরামাণিকের গলিতে থাকো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—হারু এবার কাঁদোকাঁদো। কিন্তু ভদ্রলোকের হাসি আর থামে না যেন।

"হতভাগা আহাম্মক ছেলে! তোমার এই সব বিদ্যে হয়েছে! চল বাড়িতে গিয়ে তোমার সব কীর্তির কথা বলছি!"

ভিড়ের সকলের সঙ্গে আমাকেও থ করে দিয়ে ভদ্রলোক হারুর হাত ধরে হাসতে হাসতে স্টেশনের বাইরে চলে গেলেন।

পেছু পেছু গিয়ে দেখলাম হারু তাঁর সঙ্গেই ট্যাক্সিতে উঠছে।

লজ্জা পাবে বলে কদিন আর হারুর সঙ্গে দেখা করিনি।

দিন তিনেক বাদ সে-ই অমন বেহায়ার মত আমায় খুঁজতে আসবে কে জানত! হাতে আবার একটা এয়ার গান।

"কি রে? কদিন যাস্‌নি কেন? আজ শিকারে যাব চল!"

হারুর নির্বিকার ভাব দেখে, না শিকারে যাবার কথায়, অবাক হলাম বলতে পারি না। শুধু বললাম, "শিকারে?"

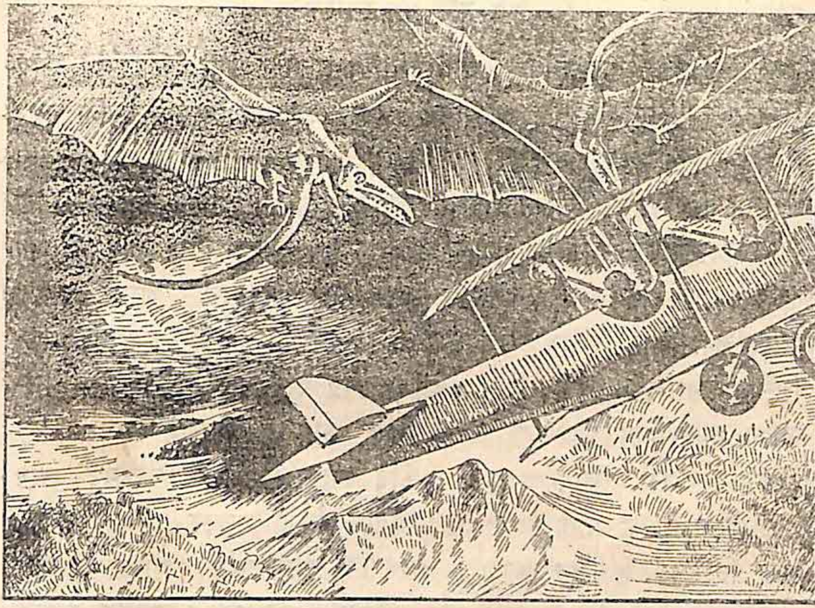
"হ্যাঁ, এয়ার গান দেখছিস্ না। দাদু কিনে দিয়েছে।"

"দাদু! দাদু কে?"

"আহা, যে দাদুকে সেদিন স্টেশনে ধরলাম, হাঁদারাম কোথাকার! চেহারাটা কি রকম ঠিক আঁচ করেছিলাম দেখেছিস্। তবে গোয়েন্দাগিরি আর করব না ভাবছি। এখন থেকে শিকার!"

হারুর স্মৃতিশক্তির দৌড়, তার বরাতের জোর, আর তার গোয়েন্দাগিরি ছাড়ার সঙ্কল্প, সব কিছুতে মিলে আমায় একেবারে ভ্যাবাচাকা লাগিয়ে দিলে।

আমি হতভম্ব হয়ে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম।



আকাশের দুঃস্বপ্ন

আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কিরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি,—একদিন যে খবর আমাদের অবাক করে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশীদূর যেতে হবে না। ১৯— সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন সার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা ত নয়! স্বয়ং সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। সার চিরঞ্জীব অবশ্য ইদানীং একটু যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটা গুজব চারধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তা' বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে! তাঁর পূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা

তখনও ত লোকে ভোলে নি। সার উপাধির দ্বারা ত তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাঙ্গলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য এশিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশ থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে তা কেউ আগে ভাবতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউ-গিনীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে অভিযানের ফলে প্রাণীবিদ্যা আশাতীত-ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করে। সার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন তার প্রতিভার খাতিরে এ অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্ত্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল সেদিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না একথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করে অনেক প্রবন্ধও বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে সার চিরঞ্জীব সহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই ব্যঙ্গ-চিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গ-চিত্রটি অকারণে আঁকা হয়নি। বুদ্ধিভ্রংশের সঙ্গে সার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে মেসোজোইক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরাণো মনে করেন সেগুলি সব নাকি অত পুরাণো মোটেই নয়, তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন যেগুলিকে আধুনিক কালের বলে নিশ্চিত বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সে সরীসৃপ বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি।

নানা দিক থেকে আঘাত খেয়ে, আহত অভিমানের জন্যেই কিনা বলা যায় না সার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ

করেছিলেন। সহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জ্জন বিশাল বাড়ীর পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীয়ন্তে কবর দিয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে কোন কাগজ মজা করবার জন্য বা অনুগ্রহ করে তাঁর যে দু' একটা লেখা ছাপত তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে সমস্ত লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজ এত বড় মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা আর মানুষখুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সে ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সে'ত নয়, তার ভেতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল তাতেই সকলে বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছল। সার চিরঞ্জীবের নির্জ্জন বাগানবাড়ীতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে সে খুন হয়নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংস ভাবে নর-হত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দুটি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্ব্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারা গায়ের মাংস উন্মত্ত ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সবচেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে তাঁকে যখন ধরা হয় তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারত না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করেছেন এমন সময়ে পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথম তিনি নামতে রাজী হন নি, এবং তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ অফিসার তখন গুলি করে তাঁর প্রপেলার ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া গেছল।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোখ কমেনি। পুলিশের লোককে যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য জেদ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে তখন তাদের কোন কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিলনা। মানুষের মুখে মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে!

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে কেউ সন্ধানও রাখলে না। দার্জ্জিলিঙের বিমান-ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কল্‌কাতা থেকে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্য্য ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাইএর জঙ্গলে ভাঙ্গা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদিবা মিলল তার চালকের কোন পাত্তা নেই। কেমন করে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংস হল তারও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হল না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হ'লে হয়ত সাধারণের আতঙ্ক এত বেশী হত' না। কিন্তু এ ব্যাপারের রহস্য আরো গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়। একজন ইংরাজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তারপরের দিন ভোরের বেলা। কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুত ভাবে ভেঙ্গে পড়ে তিস্তা নদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে ভোরের আগে

আবছা অন্ধকারে তারা চোখে ভাল না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে কি রকম বেয়াড়া ভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মত পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নীচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত উঠেছিল; কিন্তু বেশী দূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরাজ চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার সমস্ত মুখ ক্ষতবিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলান।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে দার্জ্জিলিং থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আরেকটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই জঙ্গলের ওপর পূব দিকের আকাশপ্রান্তে দুটি অদ্ভুত আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভাল করে লক্ষ্য করবার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দুটি অজানা বিমানপোতের খবরে এবার দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আই. এন. এ অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজে'র জানিত কোন এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায় নি। তা ছাড়া বিমানডাকের চালক যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল সে ধরণের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নূতন এই আতঙ্কের হুজুগে সার চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় যে চাপা পড়ে গেল কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধ হয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন-রহস্যের সংবাদ রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ রহস্যের ওপর নতুন কোন আলোকসম্পাত হ'ল কিনা তা জানার আশায়!

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এ অদ্ভুত অজানা বিমানপোত দুটি কাদের? যে দুটি এরোপ্লেন আশ্চর্য্য

ভাবে ধ্বংস হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে কিনা? আপাততঃ কোন দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিংবা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করেছে, তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তরই কেউ দিতে পারলে না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালান নিষেধ করে দিলে, কারণ দেখা গেল যে বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত, ও ইংরাজ চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলেও দেখা গেছল তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশপথের এরোপ্লেনই নয় সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। রঙ্গপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারান বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেন দুটির কোন সংশ্রব আছে তা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্য মিথ্যা নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুগের দিনে খবরের কাগজগুলি বাচবিচার না করে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজেদের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল বার্ত্তাগুলি একেই যত গাঁজাখুরী সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুসী আষাঢ়ে-গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এক গাঁয়ে এক বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল বার্ত্তার তার খবরের সঙ্গেও বেরোল যে সে বুড়ি নাকি দেখেছে আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিস নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বল্লাম,—"খবরটা দেখেছো। এরপর কোনদিন শুনব আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছভাজা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হ'ল।"

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে, খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীর মুখেই বল্লে,—হুঁ ; আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি শুধু আই. এন. এ. বা আর কেউ এ সম্বন্ধে কিছু এখনো করছে না দেখে।

ঠাট্টা করেই বল্লাম—"বেশ ত তোমার'ত নিজের প্লেন রয়েছে। তুমিই এ আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্য লাগো না?"

ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বল্লে—"লাগবোই ত ঠিক করেছি।"

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না। তারপর অস্ফুট স্বরে বল্লাম—"তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়?"

"না পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাবো ঠিক করেছি এবং আজই।"

আমি এবার ব্যাকুল স্বরে বল্লাম—"কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্য্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে জানো! তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমানবীরও ছিল। তুমি ত সবে সেদিন 'বি' সার্টিফিকেট পেয়েছ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়ো-জাহাজগুলির তুলনায় অনেক নিরেস।

অশোক বল্লে—"বিপদ আছে জেনেই ত যাচ্ছি।"

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"বিপদ যে কতখানি তা কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর তেমনি ধূর্ত্ত ও শক্তিমান। আই. এন. এ. কিছু করছে না এমন ত নয়; তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম তুমি সেখানে একলা কি করতে পার!"

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত এক উত্তর দিলে—"হয়ত আই. এন. এ-র চেয়ে আমি এ ব্যাপারের মর্ম্ম বেশী বুঝি। অন্ততঃ কোথায় তাদের দেখা পাব তা আমি জানি।"

তার কাছ থেকে আর কোন কথা না বার করতে পেরে আমি অবশেষে হতাশ হয়ে বল্লাম—"নেহাতই যখন যাবে তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।"

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বল্লে, "এ প্রস্তাব তোমার কাছ থেকে আমি আশা করছিলাম।"

সেই দিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয় কিন্তু বেশ মজবুত। টেনে টুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালান যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফল ও একটি রিভলভার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিস সে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল কিছুই বুঝতে পারিনি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্য যুগের ধরণে তৈরী। আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন চালান নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেই জন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম—প্রথমে গন্তব্য স্থানে দিনের বেলা পৌঁছে, গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব। গন্তব্য স্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তর দিকে যাত্রা করে ঘণ্টা কয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই সহরটিকে অশোকের বেছে নেবার কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু নাগরাকোটার প্রধান অসুবিধা হল এরোপ্লেন নামাবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম রাত্রে অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত না করতে পারার দরুন প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা আর হল না। দ্বিতীয় রাত্রে

যথাসম্ভব জোরালো পেট্রলের আলো মাঠের দুধারে চিহ্ন হিসাবে রেখে মাঝ-রাত্রে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোন দিন বোধ হয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব! মনে হচ্ছিল এ শুধু গোঁয়ার্তুমি করে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়ষ্টিক টেনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি মাত্র ক্ষীণ আশা তখনও মনের মধ্যে আছে,—হয়ত সত্যিই আমরা কোন কিছুর দেখা নাও পেতে পারি। কিন্তু সে আশাও সফল হবার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক উর্দ্ধে উঠে পড়ল। নাগরাকোটা সহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাক আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায় ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্ল পক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য একটু লালচে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রেখাও খানিক বাদে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নীচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালীর ছোপ। সে ছোপ কোথাও কোথাও বেশী গাঢ় কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা করে ধরতে পারছিলাম।

সহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরের জঙ্গলের

ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশী নয়, ঘণ্টায় আন্দাজ একশ' মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত বৈমানিকের পোষাক থাকা সত্ত্বেও, ঝড়ের মত যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জ্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই, তারাখচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে দুটো চোঙ লাগান রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"এ রকম ভাবে কতক্ষণ ঘুরবে! এতে লাভই বা কি!"

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিলে—"অত অধীর হোয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও ত আছে।"

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ করে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই এক ভাবে চক্কর দিয়েছিলাম তা বলতে পারিনা। পূবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায় তখন আমার খেয়াল হল। আবার চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"সকাল ত হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন করে?"

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব এল,—"শীগ্‌গীর তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে বস।"

সত্যি সত্যিই সেই কথায় একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিত স্বরে বল্লাম–"দেখতে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই–অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশী না হয়।"

এরোপ্লেন হঠাৎ কার্ণিক খেয়ে ওপর দিকে নাক তুলে প্রচণ্ড বেগে ঊর্দ্ধে উঠতে লাগল সেই মুহূর্ত্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় কিন্তু তারই ভেতর দুটি বিশাল আবছায়া অদ্ভুত মূর্ত্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলি কি ধরণের এরোপ্লেন। আমি এ রকম এরোপ্লেনের কথা কখন শুনি নি। সামনে তার কোন প্রপেলার আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরণে তাদের দুধারে ডানা যে ওঠানামা করছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ পদ্ধতিতে কোন এরোপ্লেন নির্ম্মিত হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেন দুটির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতে মনে হল কোন সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই।

তাদের বেগ বেশী হোক বা না হোক, আশ্চর্য্য তাদের ঘোরাফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয় কিন্তু সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সোজা পেছন দিকে যাওয়া এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মত নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোন রকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হল।

বন্দুক বা কোন অস্ত্র তারা কেন যে ব্যবহার করে নি তা অবিলম্বেই বুঝলাম, এবং সেই সঙ্গে সত্যই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পূবের আকাশ ফিকে হ'তে হ'তে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নীচের মাঠ গ্রাম জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে, এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ দুয়েক গজের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের এরোপ্লেন ভেবেছিলাম তারা মানুষের তৈরী কোনপ্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আব্‌ছা অন্ধকারে তাদের অতিকায় বাদুড়ের মত দেহ ও হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্ত্তমানের কোন প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয় নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক সত্যই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বল্লে—"কার সঙ্গে লড়তে হবে এবার বুঝতে পেরেছ?"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি আগেই জানতে?"

উত্তর এল—"না ঠিক জানতাম না, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।"

আর আমাদের কোন কথা হল না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলেছে। কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশঃ বেকায়দায় পড়ছিলাম মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়ত তাদের চেয়ে বেশী কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয় নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টেপাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, দুটোতে আমাদের দুপাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছন দিকে আক্রমণ করবার সুযোগও করে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা ভাবতে পারিনি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি গুলিতে তাদের একটির পাৎলা চামড়ার ডানা ফুটো করে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশী জখম হয়নি কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চীৎকার ছেড়েছে, আমাদের মোটরের গর্জ্জন ছাপিয়েও তীক্ষ্ণ ভাবে তা আমাদের কানে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুএক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপর দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে প্রচণ্ড বেগে পড়তে সুরু করল। প্লেনের সীটের ধারটা সজোরে সে সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধহয় ছিটকেই পড়ে যেতাম।

হল কি? কি আর হবে! শকুনেরা যেমন করে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারী জিনিসের মত অনেকদূর দ্রুতবেগে পড়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যই আমি বিমূঢ় হয়ে গেছলাম, এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎ বেগে নীচের মাঠ ঘাট জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি?

কিন্তু সে বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরেও। চোঙের ভেতর দিয়ে সে চীৎকার দিয়ে বল্লে,—"দেখছ কি? গুলি কর, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি।"

এইবার সামনে আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সে দিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু

করে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটিকে বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা দুটো থেকে বাদুড়ের মত পাৎলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বল্লে তার খানিকটা বর্ণনা হয় কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মত কুটিল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝান যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের ল্যাজের টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতাল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম, এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু দরকার হল না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আমাদের বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মত ওপরে উঠে গেল ভার-মুক্ত হয়ে।

পূবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম, "এবার ত নামতে হয়!"

"না, আরেকটা যে এখনো বেঁচে আছে।"—বল্লে অশোক।

"কিন্তু আমার বন্দুক সে জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে।"

"বন্দুক পড়ে গেছে।"—সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে অশোক খানিক চুপ করে রইল, তারপর আবার বল্লে,—"তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখন পাব কি না সন্দেহ। এ ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্ব্বনাশ করবে কে জানে! তুমি প্যারাসুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।"

সে যে কি করতে চায় কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন প্রায় ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুন কিংবা, তার

সঙ্গীর মৃত্যু টের পেয়ে ভয় পেয়ে কি না বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত ক'রে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাবার চেষ্টা করছে মনে হল।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লে,—"লাফিয়ে পড় এইবার।"

কিন্তু লাফাব কি, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মত ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে রেখে অশোক তার বসবার খোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সীটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল, তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি। তারপর একটি দুটি তিনটি সেকেণ্ড। তার ইসারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাসুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওপরে ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ড বেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাসুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কয় প্রাণীটির মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল, আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মত তখনও পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরাকোটা থেকে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছাবার আগেই আমাদের খবর কি রকম ভাবে সেখানে পৌঁছে গেছল। এই আশ্চর্য্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কিরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল; আই. এন. এ. থেকে আমাদের বিশেষতঃ অশোককে কি রকম সম্মান করা হয়েছিল সে সব খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথা বল্‌ব।

সে পরিণতি সার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁহার খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন

যুগের সরীসৃপ বংশ যে লোপ পায়নি তার চাক্ষুস প্রমাণ আমরাই পেয়েছি।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণীদুটিকে আমরা মেরেছিলাম সার চিরঞ্জীব নিউগিনী অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে পালন করেছিলেন, একদিন বৈজ্ঞানিক জগতকে দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দেবেন বলে। সেগুলি নাকি প্রাচীনযুগের 'টেরোড্যাক্টিলের'ই সুদূর বংশধর—আরো হিংস্র, আরো বিশালকায়। কিন্তু জানোয়ারগুলি আশাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে উঠে একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংস ভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ করতে পারে তা বুঝেই সার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাখের মারবার জন্য বেরুচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল অশোক সার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমান-ডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সব দিয়েই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। আর মফঃস্বল সংবাদে বুড়ির বাছুর চুরির যে খবর গাঁজাখুরী বলে' আমি পরিহাস করেছিলাম, তাই থেকেই কিন্তু জানোয়ার দুটিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাস পায়। নইলে নাগরাকোটার নামও সে জানত না দুদিন আগে।